চালচিত্র

আরজ বাগচী

কসমো ডিপো, ৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশকাল :
১লা বৈশাখ ১৩৬৯
এপ্রিল ১৯৬২

প্রকাশিকা :
তাপসী সেনগুপ্তা,
১১, নিতাইবাবু লেন
কলকাতা-৭০০০১২

মুদ্রক :
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় কে—

পাঠিকা

ট্যাক্সিতে চড়লেই লিফট দিতে ইচ্ছে করে

একে অফিস ছুটি হয়েছিল, তার ওপর এক কিস্তি আষাঢ়ে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। স্টপেজে স্টপেজে উপচানো মানুষ লটারীর টিকিট ধবার মত ট্রামে বাসে ভাগ্য পরীক্ষা করতে গিয়ে বারবার ব্যর্থ হচ্ছে। ভাটার স্রোতে চৌরঙ্গীপাড়া প্লাবিত, অস্থির। ট্রামবাস নিশ্ছিদ্র, গেটগুলো যেন যুদ্ধকালীন বাফ্‌ল্‌ওয়াল। এহেন সময়ে ট্যাকসি পাওয়া শুধু দুষ্কর নয়, দুষ্কার্যও বটে। সাদা পথে হবার নয়। এদিকে রাস্তাগুলো পাঁকাল হয়ে উঠেছে, স্থানে স্থানে কালির দোয়াতের মত বড় বড় গর্ত। হোলির হুলিয়া চলেছে যেন, কখন কোত্থেকে কাদা জলের পিচকিরি এসে লাগবে তা কেউ জানে না।

ট্যাকসিতে চেপে ফিরছিলাম। ট্যাকসিতে চাপলেই আমার মনটা দরাজ হয়ে যায়। কেবলি ডেকে ডেকে চেনা লোককে লিফ্‌ট্‌ দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ট্যাকসিতে অধিষ্ঠিত থাকাকালে কখনো কোনো চেনা লোককে ধারে কাছে দেখতে পাই নি। কি করে যে সবাই টের পেয়ে যায়! স্টপেজে খণ্ডিতা নায়িকার মত একলা কোনো

মেয়েকে বিষণ্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেও বড্ড মায়া হয়। মনে হয় আহা বেচারী কোথায় যাবে ও? আমি তো ওকে সেখানে অনায়াসেই নামিয়ে দিয়ে যেতে পারি। কি ক্ষতি হয় একবার মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, কোথায় যাবেন? আপত্তি না থাকে তো আমি—

কিন্তু বলা হয় না। এই মুহূর্তে নিজেকে সম্রাট মনে হলেও এদেশে সত্যিই তো ওকথা কোনো মেয়েকে মুখ ফুটে বলা যায় না। মনের দুঃখ মনে চেপেই তাই বেকার ফিরছিলাম, হঠাৎ অলকাকে দেখতে পেলাম। হ্যাঁ, অলকাই কোনো ভুল নেই। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলেও ও যেন আলাদা। কখন বৃষ্টি থেমে গেছে তবু ছাতা মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ও। বোধ হয় ট্রামের অপেক্ষায়।

বয়স হয়েছে অলকার, তবু ওর মুখে কি যেন আছে, প্রোফাইল পর্যন্ত বুকের মধ্যে বিঁধে পড়ে। মেয়েদের রূপ জিনিসটা এই রকমই। মুখের আদলে দুর্বোধ্য হরফে লেখা থাকে। চোখে পড়ে কিন্তু পাঠোদ্ধার করা যায় না।

অলকাকে কতকাল পরে দেখলাম। ছাত্র বয়সে অলকাকে ভাঙা কাঁচের টুকরো গাঁথা প্রাচীর বলে মনে হত। যেন রহস্যময় এক আকর্ষণ নিষিদ্ধ হয়ে আছে। একটু এগোলেই আর কোনো ক্ষমা নেই রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যাবে। হয়েছেও, কয়েকজন সহপাঠীর হৃদয়ে শেষ পর্যন্ত টিংচার আয়োডিন ঢালতে হয়েছিল।

পাশে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম, কিন্তু লক্ষ্য করল না। দূরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল, ভ্রু দুটি ঈষৎ কুঞ্চিত।

ডাকলাম, 'এই অলকা'—

ডাক শুনে মুখ ফেরালো অলকা, আমার মুখের দিকে সামান্য ভ্রূকুটি করে কিছু সময় তাকিয়ে থাকলো। আমি ঘামছিলাম, চার-পাশের জনতা আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে, পাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরো দুটি মহিলার মুখে ব্যঙ্গের এক মিছরি হাসি। যেন বলতে চায়, এই তো অবস্থা! অলকা যদিও আমাকে চিরদিনই একটু খাতির করে এসেছে তবু মেয়েদের কিছু বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে

অলকার মত মেয়েকে। ওর যা মনে হবে তাই করে বসবে, স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করবে না। এম-এ পাশ করে সন্ত ও তখন কলেজে পড়াচ্ছে। সেই সময়কার কাহিনীটা মনে পড়লো। একজন ছোকরা প্রফেসার তখন ওর প্রেমে পাগল। অবশ্যই একতরফা ব্যাপার। প্রেমট্রেমের মধ্যে অলকা নেই, থাকলে কবেই থাকতে পারতো। অলকার শক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সেই প্রফেসারের নিবেদন অকথ্যই থেকে গেল। অবশেষে একদিন অনেক খসড়া করে একখানা মোক্ষম পত্রাঘাত করে বসলেন। অলকার টিউটোরিয়াল খাতাগুচ্ছের মধ্যে লুকিয়ে গুঁজে দিলেন। তারপর কোনো আওয়াজ নেই, দুরু দুরু বুকে তরুণ অধ্যাপকের দিন যায়। শেষে কেমন সন্দেহ হতে একদিন অধ্যাপক বলেই বসলেন, 'ইয়ে, আমার চিঠিটা পেয়েছিলেন?'

'চিঠি? ও আপনার! হ্যাঁ পেয়েছিলাম'—

উদ্দীপ্ত অধ্যাপক সমান কদমে সঙ্গে আসতে আসতে আমতা আমতা করে বললেন, 'ও পড়েছেন তাহলে'—

'হ্যাঁ আমার দেখা হয়ে গিয়েছে, শাঁৎ করে চাবুকের মত কাঁধের ঝোলা ব্যাগের চেন খুলে চিঠিখানা বের করেছিল অলকা, 'আপনার চিঠি'—

না নতুন কোনো চিঠি নয়, অধ্যাপক নিজের লেখা চিঠিটাই ফেরত পেয়ে দেখলেন তাতে খাতা দেখা লাল পেন্সিলে কাটাকুটি করা, কোনো কোনো লাইন দাগানো এবং পরিশেষে স্বাক্ষরান্তে নম্বর দেওয়া হয়েছে, দশের মধ্যে দুই। অর্থাৎ ডাহা ফেল। এই হচ্ছে রিয়্যাল অলকা।

হঠাৎ অলকা যেন আমাকে চিনতে পারল, ট্যাকসির দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'আরে তুমি, তাই বল!'

'তোমাকে একটা নতুন খবর দিতে এলাম।'

'কি, বিয়ে করেছ?'

'আরে না তার থেকেও নতুন।'

'কি'

'বৃষ্টি থেমেছে।'

ছাতা বন্ধ করেই লজ্জিত অলকা আমাকে প্রায় মারতে এল ছাতার বাঁট দিয়ে। ট্যাকসির দরজা খুলে দিয়ে বললুম, 'কোন দিকে যাবে? এসো পৌঁছে দিই।'

বাড়িতেই ফিরছিল অলকা, তবে এখন অন্য পাড়ায় এসে উঠেছে। সংসারে শুধু বিধবা মা। বিয়ে করে নি। বোধ হয় করবেও না। আমাকে ছাড়লো না, টানতে টানতে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গেল। আগেই বলেছি অলকা আমাকে শ্রদ্ধা করে। অনেককাল, প্রায় বছর সাতেক যোগাযোগ নেই, তাতে কি! ওর ঘরে গিয়ে কিন্তু চমকে উঠলাম। দু দুটো শেল্‌ফ্‌ ভর্তি শুধু পত্রিকা, পূজো সংখ্যা, সাধারণ সংখ্যা সব থরে থরে সাজানো। শেল্‌ফের মাথায় একটুকরো কাগজে আঁটা, তাতে আমার নাম লেখা।

সেইদিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, 'আরে একি করেছ?'

'ও,' লজ্জিত হল অলকা, 'তোমার লেখা গুছিয়ে রেখেছি। তোমার লেখার আমি অন্ধ ভক্ত বলতে পারো।'

একজন পাঠকই পাওয়া যায় না, এ তো জলজ্যান্ত সুন্দরী পাঠিকা। খুশিতে ডগমগ হয়ে বললাম, 'আমার হালের লেখাগুলোর খবরও পেয়েছ দেখছি, কেমন লাগছে।'

'কেমন লাগছে?' অনেকক্ষণ বিষণ্ণ হয়ে তাকিয়ে থাকলো অলকা, তারপর বলল, 'আমি তো পড়ি না।'

একটু পরে অলকা পাশের ঘরে গেলে মাসিমা এলেন। প্রণাম করলাম। পাশের ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাসিমা বললেন, 'অলি, তোমার সঙ্গে কোনো রকম অসভ্যতা করে নি তো বাবা?'

'না মাসিমা, কি যে বলেন!'

'করলেও কিছু মনে করো না বাবা, ওর মাথাটা ইদানীং তেমন ভালো যাচ্ছে না।'

প্রণামী

ক্যারেকটার ফিক্সেশন!' টাইয়েরং ফস্কা গেরোটাকে আঙুল চালিয়ে আর একটু বেফাঁস করে নিতে নিতে বাঁকা ঠোঁটে মৃগেন বলল, 'মানে ছোরিত্তির! এর চেয়ে কাঁচা ইম্যাচিওর শব্দ আর দুটো আছে নাকি! এরকম ভেগ টার্ম—'

অটলবিহারী সেটলমেণ্ট অফিসারের মত নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে গ্লাসে গ্লাসে ঢালা ড্রাই জিন সাদা চোখে জরীপ করে যাচ্ছিল। ফলাফলে সন্তুষ্ট হয়ে জল মিশিয়ে কয়েক খণ্ড লেবু ফেলে দিল গ্লাসগুলির মধ্যে।

ফোটক সেদিকে পরম আস্বাদে তাকিয়ে বলল, 'চরিত্র যদি তোর কথাতেই নস্যাৎ হয়ে যেত র‍্যা তাহলে দুনিয়ার আর চারিত্রপূজা বলে কিছু থাকতো না। পাড়ায় তোর ক্যারেকটার শ্রিংক করে গেছে বলেই তো আর ওটাকে ফেলে দেওয়া যায় না?'

'তাছাড়া,' অটলবিহারী গ্লাস এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ক্যারেকটার হচ্ছে তোমার গিয়ে পা-টেপা ড্রেনপাইপ। যত শ্রিংক করবে ততই চোস্ত হবে—'

তরল আড্ডাটা জমে উঠেছিল রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। গিরগিটির মত দেখতে সিড়িঙ্গে চেহারার মৃগেন ইতিমধ্যেই রঙ বদল করতে শুরু করেছে। মুখে চোখে রক্তাভা জমেছে ফ্যাকাশে কটা রঙটা ধীরে

ধীরে ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। হঠাৎ এয়ার কণ্ডিশন বন্ধ হয়ে গেছে যেন, এমনি অনুভূতি সর্বাঙ্গে।

মৃগেন উত্তেজনায় নাটকীয় হয়ে উঠল, 'ডিক্সনারীতে ছাড়া আর কোথাও রিয়্যাল ক্যারেকটার বলে কিছু নেই। তাই থাক বা যাক, আমার কিছু এসে যায় না! কিন্তু আমার বক্তব্য হলো....আমার বক্তব্য হলো...কি যেন বলছিলাম আমি ?'

'হে, মনুমেণ্টাল স্পিকার, আপনি চরিত্র সম্বন্ধে—'

'হ্যাঁ...আমার বক্তব্য হলো মেয়েদের কেনাকাটার রাজ্যে ফিকসড প্রাইসের মতই চরিত্র কোথাও শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় না। দ্বিতীয় বক্তব্য হল, চরিত্র কারো ড্রাইভিং লাইসেন্স নয় যে সমাজের বেয়াড়া মোড়-গুলিতে ট্রাফিক পুলিশের কাছে শো করতে হবে! ড্যামিট !!"

মৃগেনের এই চারিত্রিক উত্তেজনার পিছনে একটি বাহিনী আছে। সেইটে আগে খুলে বলি।

সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকে প্রতি রবিবার পাত্র-পাত্রী কলমে যে সমস্ত বিশেষণ বহুল বিজ্ঞাপন বেরোয়, সেই পোস্ট বক্সের বেশীর ভাগই যে মৃগেনের নির্খোজের বেনামী বিজ্ঞাপন এমন সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ মৃগেন জীবনে প্রতিষ্ঠিত একটি খাঁটি সৎপাত্র। অর্থ, মান-মর্যাদা বয়স কিছুরই তার অভাব নেই। এহেন একটি যুবক যে একটি নামকরা ফার্মের কনফার্মড অফিসার, তাকে পাড়ার লোক সামান্যই জানতে পেরেছেন আজ পর্যন্ত। এ পাড়ায় মৃগেন নবাগত। পাড়ার কোনো সাতে পাঁচে সে কখনো নেই। সকালে সুসজ্জিত মৃগেনকে সবাই গাড়িতে করে অফিসে বেরিয়ে যেতে দেখেন, কিন্তু ওই একবারই মাত্র, কোনোদিন ফিরতে কেউ দেখেনি। গভীর রাতে আড্ডাপর্ব সমাপ্ত করে মৃগেন যখন তার ব্যাচিলর ফ্ল্যাটটিতে ফেরে, তখন সমস্ত পাড়া কোলাসে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। এই রকমই চলছিল। ঈষৎ নেশা করে মৃগেন প্রতিদিনই নিঃশব্দে ঘরে ফিরে আসে এবং প্রতিদিন সকালে আবার সশব্দে অফিসে বেরিয়ে যায়। কিন্তু সেদিন ট্যাকসি ড্রাইভার সব কাঁচিয়ে দিল। মীটার দেখে

অক্ষরে অক্ষ:ব ভাড়া দেওয়ার ফল। ড্রাইভারটা এমন শয়তান গায়ে পড়ে চেঁচিয়ে চেঁচি:য় কথা বলতে শুরু করলো সেই দুপুর রাতে: কি বাবু ঠিক যেতে পারবেন ত, না ধরে পৌঁছে দেব

ফলে এক রাত্তিরের মধ্যেই মৃগেন মাতাল বলে পড়ায় পরিচিত হয়ে গেল। প্রসিদ্ধ লাভ করলো। আর মাতাল মানেই লম্পট, লম্পট মানেই চরিত্রহীন, এ কথা কোন্ বাড়ির গৃহিণীরা না জানেন ? বিশ্বস্ত চাকরের কাছে ততোধিক বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেল পাড়ায় কারো আর তার ওপর শ্রদ্ধা নেই। প্রথমটায় একটু আঘাত লেগেছিল, ভেবেছিল কয়েক দিন সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরে সক"কে চমকে দেবে। কিংবা এমন মহৎ কাজ কিছু করে বসবে, যাতে পাড়ার সমস্ত জনশ্রুতি বদলে যায়। কিন্তু এই বয়সে অর্থাৎ ত্রিশের পর স্ত্রীকে ছাড়া যায় কিন্তু আড্ডা নৈব নৈব চ! ফলে মৃগেন কোনো দিনই আর সমস্ত রাত্তি:রে ঘরে ফিরতে পারল না। লাকিলি দু-দুবার ঘেরাও হল, কিন্তু এক যাত্রায় পৃথক ফল ফলল তার বেলায়। কেউ বিশ্বাসই করল না। কোনো খানায় খন্দে কিংবা থানায় পড়েছিল বলেই ধরে নিল সবাই। সুতরাং ক্ষিপ্ত হবে না মৃগেন তো কি হবে ? এবং কে হবে ?

আজকেও একটু পরে সশব্দে আড্ডা ভেঙে গেল। মৃগেন বলল, 'চল শ্মশানে গিয়ে একটু ধূমপান করে আসা যাক।' কিন্তু বন্ধুরা কেউ এই ধোঁয়াটে প্রস্তাবে রাজী হল না। সবাই যে যার বাড়ি ফিরে গেল। মৃগেন একাই শ্মশান যাত্রা করল। সঙ্গী জুটিয়ে নেবার ক্ষমতা মৃগেনের অসাধারণ।

নেশায় সঙ্গীই আসল। সহসেবী না হলে কিছুই জমে না। একটি রিকশাওয়ালাকে দিব্যি জুটিয়ে ফেলল মৃগেন, শুধু জুটিয়ে ফেলল না একেবারে জমিয়ে ফেলল। এমন জবরদস্ত সাহেবের কল্কে পেয়ে রিকশাওলার মিনিমাম কয়েক পুরুষ নির্ঘা:ৎ কৃতার্থ হয়ে গেল। টাইম অ্যাণ্ড স্পেস, স্থান এবং কালের জ্ঞান লুপ্ত করে দিতে গাঁজার মত জিনিস হয় না। এখন জানা গেল শুধু স্থান-কাল নয়, স্থানকালপাত্র এই ত্রিকাল-অজ্ঞ করে তোলাই গাঁজার ধর্ম।

এক সময় হাত ঘড়িতে চোখ পড়তেই চমকে উঠল মৃগেন, রাত ছটো বাজে ! বাড়ি ফিরতে হবে অথচ ট্রাম-বাস নেই ট্যাকসিও অদৃশ্য। কই বাত নেহী, রিকশাওয়ালা শপথ করলো সে বিনিপয়সায় পৌছে দেবে, মানে লিফট দেবে। নীট দু মাইল রাস্তা, কিন্তু পেশায় আর নেশায় কত তফাৎ ! একটাও শব্দ না করে গলদঘর্ম রিকশাওয়ালা এক সময় মৃগেনের পাড়ায় গিয়ে পৌছালো। মৃগেনের বড় মায়া হল। পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে দিতে গেল, কিন্তু রিকশাওলা কিছুতেই নেবেনা। অবশেষে অনেক কষ্টে বোঝালো এটা সে ভাড়া দিচ্ছে না, ভালোবেসে দিচ্ছে।

ফল ফলল এইবার। রিকশাওলা আর শব্দ করল না, হাত বাড়িয়ে নিল টাকা দুটো। কিন্তু তারপরেই এক কাণ্ড করলো। ঘামে নেয়ে ওঠা সেই আবলুষ অর্ধনগ্নমূর্ত্তিটি একেবারে শুয়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলো মৃগেনকে। হঠাৎ ওপর দিকে তাকিয়ে মৃগেন দেখল দুপাশের বাড়ির জানলায় জনালায় জোড়ায় জোড়ায় রমণীয় চোখ তার দিকেই চেয়ে আছে। পৃথিবীর এই অবিস্মরণীয় অবিশ্বাস্য ঘটনার অন্তত হাফ ডজন আই উইটনেস।

দাওয়াই

বিনয়ের কোয়ার্টারে যখন গিয়ে পৌঁছালাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ড্রইংরুমে বসে একা একা টেপ রেকর্ডার বাজাচ্ছিল ও। ওয়েস্টার্ন হট্‌মিউজিক বাজছিল স্মৃতির ফিতেয় যেন। বছর পাঁচেক আগে বিলেত গিয়েছিল বিনয়, টেপ রেকর্ডে তার শেষ সজীব স্মৃতিচিহ্ন। বুঝলাম, মনের উত্তেজনা ঢাকবার জন্যেই এই আয়োজন।

আমাকে দেখেই বিনয় লাফিয়ে উঠলো, "কি রে গিয়েছিলি? দেখা হল?"

বললাম, 'দেখা হল, কিন্তু কাজ হল না রে।'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিনয় বলল, 'আমি ঠিক জানতুম, বলতে পারবি না।'

আমি ওকে বাধা দিয়ে বললাম, 'বলেছিলাম।'

'ছাই বলেছিস', বিনয় উত্তেজিত হয়ে টেপ রেকর্ডার বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল, তেমন করে বলতেই পারিস নি।' পিছনে মুষ্টিবদ্ধ হাত নিয়ে বিদ্রোহীদের মত পায়চারি করে বেড়াতে থাকল।

বিবাহকেই বোধ হয় কোন সুরসিক দিল্লীকা লাড্ডু বলেছিলেন। কারণ, পস্তানো। নইলে খোদ দিল্লীর লাড্ডু একমাত্র এই বিবাহেরই উভয় প্রান্তে খেয়েও পস্তায়নি এমন অনেক ব্যক্তি নিশ্চয় জীবিত রয়েছেন। কিন্তু বিবাহিত লোক কখনো অনুশোচনা করছে না এমন

দেখিনি। এবং কোনো অবিবাহিত লোক ঘুণাক্ষরেও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেনি, এমনও শুনিনি।

আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে সকলেরই একে একে বিবাহ হয়েছে। হিন্দুমতে, মুসলিম প্রথায়, খৃষ্টান রীতিতে। গান্ধর্ব বিবাহ, স্বাক্ষর বিবাহ, সরব বিবাহ, নীরব বিবাহ, কূটনৈতিক বিবাহ প্রভৃতি যতরকম বিবাহ হতে পারে তার সবগুলি স্যাম্পলই একে একে বন্ধু-ক্ষেত্রে দেখেছি। কিন্তু বিনয়ের আজও বিয়ে হল না। সুন্দর স্বাস্থ্যবান শিক্ষিত জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভৃতি খবরের কাগজের সবগুলি বিশেষণই ইতস্তত না করে ফুয়েল এঞ্জিনীয়ার বিনয়ের পশ্চাদ্দেশে লাগানো যায়। হাজার টাকার ওপর মাইনে পাচ্ছে, সুন্দর বিঘেটাক জমির ওপর ফুলেল কোয়ার্টার। শুধু ফাঁকা আওয়াজ নয়, যাকে বলে ফার্নিশড, তাই। গাড়ি নেই, তবে কোম্পানীর কাছ থেকে লোন্ নিয়ে গাড়িও শিগ্‌গিরই কিনে ফেলবে বিনয়।

এহেন বিনয় দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর পর্যন্ত অবিবাহিত রয়েছে, ভাবা যায় না। আজ বছর কয়েক ধরে বিনয় বিবাহ করতে ইচ্ছুক রয়েছে, আমার মত ঘনিষ্ঠ দু'চারজন বন্ধুর কাছে মনের বাসনা অকপটে ব্যক্ত করেছে, কিন্তু তার জন্যে আমরা আজ পর্যন্তও কিছু করতে পারিনি। জন্মমৃত্যুবিবাহকে যাঁরা নিয়তির নির্বন্ধ বলে আকাশের দিকে হাত তোলেন তাঁরা প্রকারান্তরে মিথ্যে কথাই বলেন। জীবন ঈশ্বর দত্ত হতে পারে কিন্তু বিবাহ যে কখনো কখনো পিতৃদত্ত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। অন্তত বিনয়কে আপাদমস্তক জানার পর থেকে তো বটেই। বিনয় বিলিতী বউ আনেনি, বিনয় কাউকে ভালোবেসে টেসে একাক্কার কাণ্ড ক'রে বসেনি, মেয়ে সম্বন্ধেও বিনয়ের ঠগ্‌বাছা পছন্দ নয়, তবু বিনয় বিবাহে যে সক্ষম হয়নি, সে ঈশ্বর ইচ্ছায় নয়।

সব কিছু বুঝতে গেলে বিনয়ের বাড়ি এবং বিশেষ করে বিনয়ের বাবা সম্বন্ধে আপনাদের জানতে হবে। কারণ এইমাত্র আমি কলকাতা থেকে হাঁপাতে হাঁপাতে ভগ্নদূতের মত বিনয়ের বাড়ি থেকেই ফিরছি। বিনয়ের বাবার সঙ্গে ইন্টারভিউ সেরেই সটান বন্ধুর কাছে ছুটে এসেছি।

উত্তর কলকাতায় বিনয়দের বাড়ি মানেই একটি বিরাট ধর্মশালা। মানে সেই রকম ব্যাপার আর কি! সেখানে এই বাজারেও লোক-জনের আসা-যাওয়ার খাওয়া-থাকার বিরাম নেই। আত্মীয়-আনাত্মীয় স্বজন-পরজন, গ্রামতুতো, পড়শী যে কেউ অক্লেশে বিনা নোটিশে সে-বাড়িতে আসছে, খুশিতে থাকছে এবং স্বেচ্ছায় চলে যাচ্ছে। ফলে বিনয়ের অনেকগুলি ভাইবোন দাদা বৌদি ভাইপো ভাইঝি মামা এবং মামার মত ছাড়াও ইত্যাদি প্রভৃতিতে ওদের বিরাট বাড়িটা সব সময় গমগম করত। এখনো করে। কাচ্চাবাচ্চার কিচির মিচিরে কানপাতা দায় হত। এখনো হয়। টেলিফোনে কথা কওয়া এক সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

বাড়িটার কোথাও প্রায় আড়াল আব্রু বা ব্যক্তিগত বলে কিছু ছিল না। উনুন দিনে রাতে মাত্র ঘণ্টা তিনেকের জন্য নিভতো। বাকি সময় অবিশ্রাম হোটেলের মত চায়ের জল ফুটতো, ফাঁকে ফোকরে অবসর সময়ে রান্না হত।

কলকাতার মত শহরে এমন একটি সার্বজনীন বাড়ি থাকলে যা হয়, স্কুল ফাইনাল হায়ার সেকেণ্ডারী থেকে শুরু করে এম এ এবং পাবলিক সার্ভিস পর্যন্ত সর্ববিধ পরীক্ষার্থীরা এখানে থেকে পরীক্ষাপর্ব চুকিয়ে যেত। এমন কি মেয়ে দেখানোও। কোনো কোনো মফঃস্বলী কন্যাপক্ষ অনেক সময় এখানেই প্রদর্শনী খুলতেন।—বিনয়ের বাড়িতে আমি মাঝে মাঝে যখনই গিয়েছি কিছু নতুন মুখ দেখেছিই।

বাড়ির যিনি কর্তা তিনি কঠিন উকিল এবং নিদারুণ দার্শনিক। দর্শন বিষয়ে এম এ পাশ করে ক্ষান্ত হননি, বৃদ্ধ বয়সে সংসারের নিশ্ছিদ্র চাপের মধ্যেও থিসিস রচনা করে ডকটরেট হয়েছেন। গম্ভীর, রাশভারি মানুষ চোখের দৃষ্টি পলকে ঝলসে ওঠা ছুরির মত; তাকাতে ভয় করে, পাছে একেবারে ভিতরে বিঁধে পড়ে। বাড়ির প্রতিটি মানুষ সমান ব্যবহার পাবে, এই তাঁর অলিখিত কড়া নির্দেশ। সুতরাং ইনিই যখন বিনয়ের পিতা তখন তার বাল্য-কৈশোর-যৌবন কিভাবে কেটেছে বলাই বাহুল্য। বাড়িতে রাশি রাশি টাকা ব্যয় হলেও বাড়ির

ছেলেরা ছেঁড়া প্যাণ্টে শূন্য পকেটে হৃত-দরিদ্রের মত মানুষ হয়েছে।

কিশোর বয়স থেকেই বিনয় বৈঠকখানা ঘরের বিরাট সেক্রেটারিয়েট টেবলের এক পঞ্চমাংশ জুড়ে পড়াশোনা ক'রে এসেছে। বাকি অংশে অন্য ছাত্রশরিক। যখন এঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে তখন বইপত্র যন্ত্রপাতির কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় ওই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে কুলিয়ে নিতে যথেষ্ট কষ্ট হত। তবু উপায় নেই। কখনো কখনো ধেত্তুরি বলে আমাদের বাড়িতে চলে আসতো বইখাতা নিয়ে।

একমাত্র রাত্রে, যখন সিঁড়ির তলা থেকে প্রতিটি ঘরের মেঝে পর্যন্ত নানা আকারের রহস্যময় চেহারার বিছানায় ভরে যেত, অন্ধকারে বাইরে যেতে হলে যখন মাইন পাত যুদ্ধক্ষেত্রের মতই সন্তর্পণে অনেক ঝুঁকি নিয়ে পা ফেলতে হত, তখন, কেবলমাত্র তখনই বিনয় ওই টেবিলটির অখণ্ড মালিকানা স্বত্ব ভোগ করত। অর্থাৎ রাতে তার শোবার জায়গা ছিল ওই টেবিলটিই। বড় বয়সে শুধু ওর সঙ্গে গুটি দুই চেয়ার জুড়ে নিয়ে তার ওপর একটি আলমারীর ভাঙা পাল্লা চাপিয়ে সর্বাঙ্গে কুলিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে নিতে হত। বর্ষা এবং শীতের রাত্রে ওদের ছাদ থাকতো জনহীন। বিনয় তখন কোনো কোনো রাত্রে সেখানে বিলাসিতা করে শুতে যেত। মাঝরাতে বৃষ্টি এলে বিছানা শুদ্ধ নিজেকে হোল্ড অলের মত চটপট গুটিয়ে নিয়ে জল থামার অপেক্ষায় ঘুম চোখে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকতো। যাকে বলে পাটিসাপটা হয়ে।

এমনি করেই বিনয় একদিন বিলেত গেল। বিলেত যাবার আগের রাত্রেও এই একই রকম কৃচ্ছ্রসাধন করে গেল। অন্য বাড়ি হলে, পাশপোর্ট ইত্যাদি তৈরী হবার সময় থেকেই তারা সুখ সুবিধার জন্যে পৃথক ব্যবস্থা হত, এটা ওটা সেটা রান্না হ'ত। বিশেষত মা যেখানে এখনো বেঁচে রয়েছেন। কিন্তু এবাড়িতে সবই আলাদা। বিনয়ের বিলেত যাওয়াটা এ বাড়ির কারো কাছেই একটা ব্যাপার নয়। কেউ ভ্রূক্ষেপই করল না। ওর বাবা শুধু বিদায়ী প্রণাম নেবার সময় আশীর্বাদের ভঙ্গিতে বলেছিলেন, "চিঠিপত্তর দিয়ো, যখন যেমন

থাকোটাকো দু'লাইন লিখে জানিও।"

বিনয় ছোট ক'রে জবাব দিয়েছিল, 'দেব।'

তারপর বছর দুই পরে বিনয় ফিরে এসেছে। বিলাসকলাকৌতুহল ভরা জীবনপ্রাচুর্যের ভেতর থেকে আবার সেই আকৈশোরের চেনা সেক্রেটারিয়েট টেবল আর আলমারীর ভাঙা পাল্লায়। আর্থাৎ পুর্নমুষিক, বিলেত যাবার আগে কলকাতার চাকুরী-জীবনে যেমন ছিল। অবশ্য স্থিতিটা এবাব বেশী দিনের হল না, দুর্গাপুরে সহসা চলে এল।

পায়চারি থামিয়ে বিনয় বলল, বাবার সঙ্গে তোর কি কথা হল খুলে বল।'

'যেমন যেমন রিহার্শাল দিয়ে গিয়েছিলাম, প্রথমেই কোনোরকম জেরা টেরা করার সুযোগ না দিয়েই, বর্তমান অবস্থায় আধুনিক যুবক মাত্রেরই বিবাহ করার জরুরী প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা আরম্ভ করেছিলাম। অর্থাৎ আমার মূল বক্তব্যে ভূমিকা আড়াই লাইন মাত্র গড়গড় করে মুখস্থ বলেছি অমনি মেসোমশাই, মানে তোর পিতৃদেব বাধা দিয়ে বললেন, জানি, এবার তুমি আসল কথা বল। প্রস্তুত ছিলাম না, তবু পয়েণ্ট-ব্ল্যাঙ্ক বলে দিলাম, বিনয়ের বয়স হয়েছে, তাই ভাবছিলাম'—

বিনয় অধৈর্য গলায় বলে উঠল, 'বল, থামলি কেন, বলে যা। এখানে থামা মানেই বাবাকে সুযোগ দেওয়া।'

'আমি থামিনি, মেসোমশাই ট্রাফিক পুলিশের মত হাত দেখিয়ে এখানে আমাকে থামিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'বিনয়ের বয়স নিয়ে ভাববার কিছু নেই, ওর বয়স হয়েছে আমি জানি। ওর অর্ধেক বয়সে আমার বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়ের বয়স হলেও বিয়ে করার মত দায়িত্ব-বোধ বিনয়ের আদৌ জন্মায় নি।' ব্যস পূর্ণচ্ছেদ! কঠিন হাসি হেসে মেসোমশাই আবার মক্কেল-আলাপে চলে গেলেন!'

'দায়িত্ব-বোধ জন্মায় নি!' বিনয় আমাকে উপলক্ষ্য করে হুঙ্কার দিল, দায়িত্ববোধ কাকে বলে? এই যে এত বড় ডিপার্টমেণ্টে-

এতগুলো লোককে চালাচ্ছি, এত জটিল মেশিনারী নখদর্পণে রাখছি, এটা দায়িত্বজ্ঞান ছাড়াই চলেছে। হুঁঃ! মেয়েছেলের নিকুচি করেছে লাইফে বিয়েই করব না শা'—

সঙ্গে সঙ্গে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মোছার মত ঠোঁটের ওপর হাত ঘষে পার্লামেণ্টারী শালা শব্দটাকে চকিতে যেন ইরেজ্ করে দিল। তারপর অত্যন্ত শান্ত গলায় বলল, 'এরপর আমার সামনে দুটো পথই আর খোলা রইল। আত্মহত্যা অথবা বলপূর্বক বিবাহ।'

অবশ্য বিনয় ঠিকই বলেছে। মেসোমশাইকে উদ্যোগী করে তুলতে আমরা কিছু কার্পণ্য করিনি, সব পথেই চেষ্টা ক'রে দেখেছি। যে বিনয় মাসে দুবার কলকাতায় যায় সে টানা এক মাস আমারই পরামর্শে চিঠি পর্যন্ত লেখেনি বাড়িতে। টনক নড়েছে ঠিকই। ওর বাবা পর পর দু'খানা পত্র দিয়েছেন। একখানায় লিখেছেন, স্নেহের খোকন (বিনয়ের ডাক নাম), তোমার এই জাতীয় আচরণে বিস্মিত হইয়াছি। যাহাই হউক, আমার এই চিঠিকে টেলিগ্রাম জ্ঞান করিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। গৃহে তোমার মাতা যারপরনাই উদ্বিগ্ন।

পরের চিঠিটাও প্রায় একই সঙ্গে এসেছিল তাতে কোনো কথা লেখা নেই। শুধু বিনয়ের বাবা তাঁর পুরো নাম আর ঠিকানা লিখে পাঠিয়েছেন। পিতৃনাম যদি স্মরণ না থেকে থাকে এতদুদ্দেশ্যে বোধ হয়। কিন্তু ওই গম্ভীর কঠিন মানুষটি ক্রুদ্ধ হয়েও এরকম রসিকতা করবেন আমরা ভরসা করে অতটা ভাবতেই পারিনি।

আবার বেশ কিছুদিন যাবার পর বাড়িতে লিখে জানানো হল, হোটেল-ক্যান্টিনে খেয়ে বিনয়ের শরীর আর টিঁকছে না।

ভাবলাম এবার একটা বিহিত হবে। হলও। বাড়ি থেকে একটি ওড়িয়া ঠাকুর হাতা খুন্তি চাটু সমেত বিনয়ের কোয়ার্টারে এসে পৌঁছলো। রন্ধনের পাকাপাকি বন্দোবস্ত। আমরা দমে গেলাম।

শেষে অনেক পরামর্শ করে মোক্ষম (আমাদের জ্ঞানতঃ) অস্ত্র ছাড়লাম। আমি নিজে লিখলাম। এই স্বজন বন্ধনহীন টাউনশীপে

বিজন কোয়ার্টারে দীর্ঘকাল একা একা বাস করার ফলে বিনয় যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছে। এটা মস্তিষ্ক বিকৃতির পূর্বলক্ষণ কিনা বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, অবিলম্বে এই নির্জনতা ভঙ্গ করা দরকার। সুতবাং বাড়ি থেকে আপনারা কেউ যদি ওর কাছে এসে থাকেন ভা:লা হয়।—ঝুঁকি নিয়ে লিখলাম। মনে মনে ভালো করেই জানতাম কেউ আসবে না বাড়ি থেকে।

পত্রপাঠ টেলিগ্রাম এলো। দিনে রাতে তিনবার সেব্য। পূর্ণ বিবরণ পরে যাইতেছে। পরের দিনই একটি পার্শ্বেল এলো তাতে এক শিশি হোমিওপ্যাথী ওষুধ এবং তার সেবনবিধি।

কাণামাছি

ঘরে বসে তখন গত সপ্তাহের লেখাটি লিখছিলাম। হঠাৎ কে যেন এসে চশমা শুদ্ধ চোখ টিপে ধরলো। হাতের স্পর্শ ভালো করে বুঝতে পারলাম না, তবে মেয়েলী হাতে ধরা পড়েছি সেটা মালুম হলো। এক জোড়া মোটা বালার ধারালো নক্শা। আমার কানের পাশে ঘাড়ের ওপর এসে বিঁধলো।

নিজের স্ত্রী কখনো, সেই আত্মিকালেও, এরকম ছেলেমানুষীর, আই মীন মেয়েমানুষীর ধার দিয়ে যায়নি। তার ওপরে একটু আগেই সে রীতিমত একপশলা কলহ করে কিসব কেনাকাটা সারতে বাইরে বেরিয়েছে। সুতরাং এই বিপত্নীক অবসরে আবার অযাচিতভাবে কোন রমণীয় আবির্ভাব ঘটলো মনে মনে সেই কথাই ভাবছি, এমন সময় পিছনে যে ছিল সে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

প্রায় অচেনা কণ্ঠ, বিশেষ করে মেয়েরা শব্দ করে হাসলে ওই রকমই হয়ত মনে হয়, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। ব্যাপারটা এবারে সত্যিই রোমাঞ্চকর বলে বোধ হল। আমার জ্ঞাতসারে ধারে কাছে এমন কোনো গায়ে-পড়া রহস্যময়ী আছে তা তো জানি না।

সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলাম। স্ত্রীর নামোচ্চারণ করে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করলাম, সব সময় এরকম গায়ে-পড়া ভালো লাগে না বুঝেছ?'

'বুঝেছি' আমাকে দৃষ্টি দান করে পশ্চাৎবর্তিণী এবার সামনে এসে দাঁড়ালো, আর ফল্‌স্‌ দিতে হবে না মশাই।'

হাতের ছোপ লেগে চশমার কাচ দুটো ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, তাড়াতাড়ি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কাচ মুছে দেখি এক সুন্দরী-সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে। কোথায় যেন এ.ক আগে দেখেছি ঝট করে স্মরণ হলো না। কিন্তু মুখে সে ভাব গোপন রেখে বললাম 'ফল্‌স্‌ কি রকম?'

'আহা ন্যাকারে!' প্রমাণ সাইজের সুন্দরী বারো তের বছরের খুকীর মত একটা ভঙ্গি করল, হাসলো, মাথার কোঁকড়া স্প্রাংয়ের মত পাকানো পাকানো চুলের রিংগুলো থোকা-থোকা কালো আঙুরের গুচ্ছ হেন দুলে উঠলো, গালে টোল পড়ল। ওর চোখের কালো ভোমরা দুটো যেন সাদা ফুলের ওপরে টাল খেয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎস্ফুরণের মত ওকে চিনতে পারলাম। এতো আমাদের পাড়ার মুকুন্দবাবুর মেয়ে বিজলী, আজ বছর চারেক হলো শিলঙে বিয়ে হয়েছে। আমি অবশ্য তারও বছর খানেক আগে থেকে ওকে দেখিনি, কারণ আম নিজেই দেশের বাইরে ছিলাম। কিন্তু বিজলীরাণী এক সময় আমাদের বাড়িতে খুব আসতো। দস্যি মেয়ে ছিল বিজলী, দুষ্টুমি তার মাথায় সব সময় কোঁকড়া চুলগুলির মত কিলবিল করত। কিন্তু সেই বিজলীর চেহারা একি হয়েছে! রজনীগন্ধার ডাঁটির মত ছিপছিপে ছিল যে সে এখন রীতিমত মন্থরা দেহে অনেক পোঁচ মাংস এবং চর্বি লেগেছে। দস্তুর মত ভারিভরাট মহিলা-মহিলা ভাব এসেছে চেহারায়। চোখ-মুখ বেশ সুখী-সুখী এখন।

হেসে ফেলে বললাম, 'কেন, ন্যাকা কেন?'

'বাঃ বৌদির সঙ্গে একটু আগে তোমার যে রাগরাগিণীর আলাপ হলো তা আমি শুনিনি ভেবেছ? সব শুনেছি'—

ছেলেমানুষের মত মুখভঙ্গি করল বিজলী। ঠিক আগের মতই

আছে ও। কৃত্রিম রাগের ভঙ্গি করে বললাম, 'অসভ্য মেয়ে, গুরুজনের তর্জা শোনা হচ্ছে আজকাল আড়ি পেতে? তারপর কবে এসেছিস?

একটা চেয়ার টেনে আমার মুখো-মুখি বসলো বিজলী, বলল, 'দিন তিনেক।' তা তুমি এখন লেখক হয়েছ, আমাদের কথা কি আর তোমার মনে পড়ে!'

বললাম 'কি যে বলিস!'

অভিমানী গলায় কথা বলল বিজলী, 'ঠিকই বলি। নইলে চাল-চিত্তিরে কত হেভি পেঁজিকে নিয়ে গল্প লিখলে, কই আমাকে তো তোমার মনে পড়লো না?'

'দূর পাগলী।' আমি আদর করে কলমের হ্যাণ্ডেল দিয়ে ওর মাথায় মারলাম, 'তোকে নিয়ে আবার কি লিখবো, আমি তো রোমান্টিক গল্প লিখি না। রোববারের পাতায় একটু ঠাট্টা-তামাশা-নকশা করি বৈ তো নয়। তার মধ্যে তুই কোথায় আসছিস?'

'তাও আসি না!' গলার স্বর ভারি হলো, 'আমি এতই ফ্যালনা! আমি তোমার চোখে এতই ফ্যালনা···বেশ বেশ'—

চোখের জমি ছলছল হল বিজলীর। চেয়ার থেকে উঠে চলে যেতে উদ্যত হলো। আমি ওর হাতটা ধরে ফেললাম খপ করে, বললাম, এই মেয়ে, কি হচ্ছে ছেলেমানুষী—

হঠাৎ জানলার দিকে চোখ পড়তেই মনে হলো কে যেন উঁকি মেরে দেখছিল। আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হতেই সাঁ করে সরে গেল। দৃশ্যটা বাইরে থেকে কিঞ্চিৎ খারাপ দেখাতে পারে, কারো কৌতূহল সঞ্চার করতে পারে এতক্ষণ ঘুণাক্ষরেও মনে হয়নি। বললাম, কে যেন রাস্তা থেকে উঁকি মেরে আমাদের দেখছিল রে—'

'কে?'

আমি ভালো করে দেখতে পাইনি। তুই তো এতক্ষণ জানলার দিকে মুখ করে বসে ছিলি, কাউকে দেখিস নি?

'কই না তো!' বিজলীর মুখে এক ঝলক হাসি খেলে গেল। মুখ-পোড়া' এগিয়ে গিয়ে দড়াম করে জানলা বন্ধ করে ফিরে এল,

তারপর আবার বসল। আবার সেই প্রসঙ্গ। আমি যেন ওকে নিয়ে এক কিস্তী চালচিত্তির লিখি। ওর নাম গোপন করার কোনো দরকার নেই। আর আমি যেন ওর একখানা ছবি অন্তত আঁকিয়ে দিই। চণ্ডী লাহিড়ীকে যেন অবিশ্যি অবিশ্যি রিকোয়েস্ট করি। রবিবারের পাতায় ওর ছবি বেরোবে—কতদিনের ইচ্ছে।

বিজলীর কথাগুলো শুনে গেলাম। কোনো জবাব দিলাম না। দিয়ে লাভ কি। অবুঝ মেয়ে, মনে মিথ্যেই দুঃখ পাবে। বিজলীকে নিয়ে সত্যিই তো আর গল্প হয় না। যত-দুর জান ওর জীবনে গল্প করার মত কোনো ঘটনাও নেই। থাকলে এই সুবাদে নিশ্চয় আমাকে ও বলত। শিলঙে একজন এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। সুখে স্বচ্ছলতায় আছে, মোটা হয়েছে। এছাড়া আর কোনো খবর নেই। এ নিয়ে কি আর লিখবো, তাছাড়া মনে মনে একটা কথা ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, আগমী সপ্তাহ থেকে চালচিত্রের পাত্তাড়ি গুটোচ্ছি। লেখা বন্ধ হয়ে গেলে, ও নিশ্চয়ই আর আব্দার করতে আসবে না।

হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, মনে থাকলো তোর কথা।,

বিজলী খুশী হয়ে চলে গেল। যেতে যেতে আবার ফিরে এসে শুধু বলে গেল কি জন্যে আমার কাছে এসেছিল কেউ এসে যদি জিজ্ঞাসাও করে আমি যেন না বলি। আমি সম্মত হলাম।

বিজলী সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করতে আজ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে আসেনি। তবে আমি অনুসন্ধান করে জেনেছি, সেদিন আমার জানলার সামনে থেকে কে ছায়ার মত সরে গিয়েছিল। আপনারাও ঠিকই অনুমান করেছেন। সে বিজলীর একজন নিকটাত্মীয়, সে বিজলীর স্বামী। বিজলী তাকেই অস্থিরভাবে খেলাবার জন্যে নিশ্চয় আমার কাছে এসেছিল গল্প লেখাতে নয়। পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরা ইত্যাদির অর্থ অতঃপর স্পষ্ট হল।

স্ত্রী-রক্ষা

কেউ কেউ থাকেন টাইপরাইটার, যাঁরা স্টেনোগ্রাফারের মত শর্টহ্যাণ্ডে আপনার আমার মুখের কথা হুবহু টুকে নিয়ে গিয়ে পরে গল্প বানিয়ে ফেলেন। তাঁদের অনেক সময়ই আমরা চিনতে পারিনা। হাওয়া বদলাতে গিয়ে হোটেলে হয়ত মুখচেনা গোছের আলাপ হয়, কিংবা দূর পাল্লার ট্রেনে দৈবক্রমে রিজার্ভেশনের গুণে মুখোমুখী গল্পগাছায় আমাদের হয়ত স্বল্প মেয়াদে জড়িয়ে ফেলেন। অথবা লোকাল ট্রেনে খবরের কাগজে মুখ ঢেকে ঘণ্টাখানেক পাশে বসে থেকে কখন অলক্ষ্যে নেমে যান, আমরা খেয়ালেই আনি না। তারপর কোনো এক রবিবারের পাতায় কিংবা ঢাকাই সাইজের পূজোসংখ্যায় নিজের চেহারা ছাপার অক্ষরে হুবহু দেখতে পেয়ে তাজ্জব হয়ে যাই। যেন টেপরেকর্ডে নিজের খাঁটি গলা এবং বলা কথা নির্ভুল রকম শুনতে পেয়ে চমকে উঠি। তখন বন্ধুজনকে ডেকে ডেকে বলি, 'ওহে এই গল্পটা পড়েছো। ওটা আসলে আমারই ব্যাপার, আমারই কথা, বিলিভ মি অর নট!'

আমাদের পরিচিত সমাজে নিজের পাড়ায় কিংবা চেনা জানার মধ্যে যখন এই ধরনের লেখক থাকেন তখন তিনি যথেষ্ট দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেন। কারণ অনেকেরই ঘরের কথা পেটের কথা কর্ক স্ক্রু মেরে বের করে আনেন, দাম্পত্য-জীবনের টপসিক্রেট নিজের কল্পনার সোডাওয়াটারে মিশিয়ে পাবলিকলি খবরের কাগজের গেলাসে ঢালেন।

আমাদের মলয় তালুকদার কিন্তু তার থেকেও বিপজ্জনক লেখক। পরিচিত ঘরে সংসারে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে প্রেমের উপাখ্যান দু'হাতে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যারা তাকে কাছ থেকে জানে তারাই জানে ওটা তার একটা ভান মাত্র। আসলে সে মেয়েদের খুঁজে বেড়ায়, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে এবং পরিণামে একটা অবৈধ উপসংহারে গিয়ে পৌঁছায়। মেয়েদের আকর্ষণ করবার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার, কথার ভঙ্গিতে। চোখে কিছু যাদু আছে মলয়ের। যেকোনো স্বামীর থেকে এ ব্যাপারে সে অনেক বেশী কোয়ালিফায়েড। যে কোনো রকমের মেয়েই হোক, মলয়কে শুধু তার পাশে রেখে যান। ঘণ্টা কয়েকের জন্য ডিস্টার্ব করবেন না, তারপর ফিরে এসে সেই মেয়েকে আস্ত ফিরে পাওয়া শক্ত হবে আপনার পক্ষে। তার হৃদয়ে হয় রাহাজানি নয়ত মন ছিনতাই হয়ে গিয়েছে। মলয় তালুকদার খুব ট্যালেনটেড লম্পট সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে ইতিমধ্যেই আমাদের পরিচিত পাঁচ-ছটি পরিবারের শান্তি নষ্ট করেছে। ট্রেচারাস মলয়কে কেউ আমরা পছন্দ করি না, বন্ধু বলে স্বীকার করি না কিন্তু সে ছিনে জোঁকের মতই বন্ধুমূর্তিতে আমাদের গায়ে লেগে আছে। বন্ধুত্বের ফেক্ লেবেলের মত।

তাই শচীন যখন বৌভাতে মলয়কে নিমন্ত্রণ করলো আমরা সবাই একবাক্যে বারণ করেছিলাম। কেউ নিজের পায়ে কুড়ুল মারতে চাইলে আমাদের অবশ্য বলার কিছু থাকে না কিন্তু মেয়েরা বিশেষ করে স্ত্রী-য়েরা বিধাতার এমনই এক আশ্চর্য সৃষ্টি যে তাঁরা কখন যে কোনদিকে ঝুঁকবেন বলা অসম্ভব।

বৌভাতের পরদিন সন্ধ্যেবেলার কথা। আবার আসবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে মলয় একটু আগে বিদায় নিয়ে চলে গেছে, কিন্তু তখনো তার রেশ কাটেনি যেন। মলয় এমন একটা নাটকীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে বসে যে তার তুলনা হয় না। দ্বিতীয়বার নিজে হাতে পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে সেই কথাই ভাবছিলাম। শচীনের স্ত্রী মাধুরী করতলে চিবুক রেখে মুগ্ধ হয়ে ব'সে আছে। যেন একটা অদৃশ্য লং প্লেইং ডিস্ক্ তখনো তার কানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেজে চলেছে। শক্ত চোয়ালে শচীনও চুপ ক'রে বসে আছে।

'তোমার এই বাল্যবন্ধু', মাধুরীই শেষপর্যন্ত নীরবতা ভঙ্গ করল, 'সত্যিই আশ্চর্য মানুষ!'

আমি শচীনের মুখের দিকে তাকালাম। শচীন মাধুরীকে মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর হঠাৎ মাধুরীকে সাঁড়াশী আনতে বলল। আমি আর একটু হলেই চায়ের পেয়ালায় ভীষণ রকম বিষম খাচ্ছিলাম। সদ্য বিবাহিত মাধুরী স্বামীর মন মেজাজ মর্জী কিছুই তখনও ভালো করে জানে না। বিস্ময়ে বড় বড় চোখ করে আমার দিকে তাকালো। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমার চন্দ্রবদনটি যথেষ্ট ভাবলেশহীন, কিছুটা বোকা-বোকাও, মাধুরী তাই কিছু অনুমান করতে পারল না। অনুমান আমিও করতে পারছিলাম না। শচীনের মনের মধ্যে কি মতলবের উদয় হয়েছে। গল্পের বইয়ের শখের গোয়েন্দা ছাড়া আর কেউ অদ্যাবধি এই ধরনের খাপছাড়া উদ্ভট আপাত কার্য-কারণহীন ফরমাশ করেছে বলে আমরা কেউ শুনিনি। শচীনের স্থির গম্ভীর মুখখানা দেখে মাধুরী অবশ্যই কোনো প্রশ্ন করতে সাহস করলো না, উঠে রান্না ঘর থেকে সাঁড়াশী আনতে গেল। মাধুরী ভেতরে যেতেই আমি কিছু একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু শচীন আমার দিকে একচোখ বুজে একটা লঘু ইশারা করলো। সুতরাং আমি মুখ বুজে সব দেখে গেলাম।

সাঁড়াশী এলো। অতি সতর্কতার সঙ্গে সাঁড়াশী দিয়ে লোকে যেমন বিষ-ধর কাঁকড়াবিছে ধরে তেমনি ক'রে শচীন সোফায় ঢাকাটা তুলে

ঘরের বাইরে বারন্দায় রেখে এল। মলয় ওই সোফাটার ওপর এতক্ষণ বসেছিল। তারপর মলয়ের শূন্য কাপডিশ্ ওই একইভাবে সাঁড়াশী দিয়ে নিয়ে গেল। ফিরে এসে বলল 'ওই কাপডিশটা আলাদা করে সরিয়ে রাখবে।'

তারপর ডেটলে ন্যাকড়া ভিজিয়ে সোফাব হাতল এবং আরো সন্দেহজনক জায়গাগুলো নিজে হাতে মুছে ফেলল শচীন। আমি ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারলাম না। মলয় চারিত্রিক দিক থেকে পয়জনাস হতে পারে কিন্তু তার কোনো ভয়ঙ্কর সংক্রামক গুপ্তব্যাধি আছে বলে আমরা কেউ জানিনা।

মাধুরী একবার ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করলো, 'কি হয়েছে গো? ওঁর কি কোনো'—শচীন তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল 'ও কিছু না।'

নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবের ব্যাপারের মধ্যে স্ত্রী নতুন এসেই নাক গলাবে এটা যেন তার অভিপ্রেত নয়।

সেদিন আর আড্ডা জমলো না। কয়েকদিন পরে রাস্তায় শচীনের সঙ্গে দেখা। একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'শচে, সেদিন তুই ওরকম পাগলামী করলি যে?'

শচীন মুচকি হেসে বলল, 'যে উদ্দেশ্যে করেছি, ফল ফলেছে। আমার সে রাতের অপারেশন সাকসেসফুল হয়েছে। আমি 'টুরে' যাবো, মলয় ব্যাটা সেই ফাঁকতালে এসে আমার ভালো-মানুষ বউটাকে জ্বালাবে আর আমি মুখ বুজে সহ্য করবো! দিয়েছি ওর লাইফ টাইম বারোটা বাজিয়ে।'

হেসে বললাম, 'ফল হয়েছে কি করে বুঝলি?'

'আরে সে রাতে তো বউ লাইফ হেল করে তুলেছিল আমার। খালি নাকি কান্না, ইনিয়ে বিনিয়ে সেই এক কথা. লক্ষ্মীটি পায়ে পড়ি বলো না কি হয়েছে, একবারটি বলো। মেয়েদের কি রকম মার্ডারাস কৌতূহল থাকে তুই তো জানিস!'

'তা তুই বললি কিছু মাধুরীকে?'

'ক্ষেপেচিস্? আমি একেবারে ফুলস্টপের মত চুপ। কাল হঠাৎ

ঘরে গিয়ে দেখি মাধুরী চুপি চুপি টেলি-ফোনের ইয়ার-পীস ডেটল দিয়ে মুছে রাখছে। আমাকে দেখে লুকোলে কি হবে' শচীন হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাসলো. 'ব্যাপারটা ওকে ধরেছে।'

'বুঝলাম না।'

'না তুমি ন্যাকা! মলয় টেলিফোন করেছিল মাধুরীকে। কিন্তু বাবা—মাধুরীকে সে জিনিস পাওনি'—প্রায় পৈশাচিক হাসি হাসতে হাসতে শচীন চলন্ত বাসে উঠে পড়ল।

বিবাহ
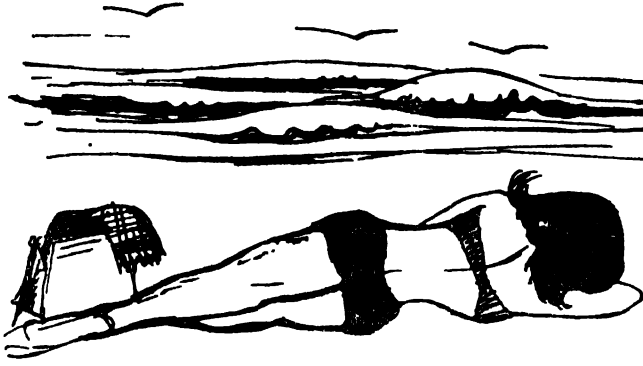
সমুদ্রের বিশাল ক্যানভাসে ওয়াটার কালার অস্থিরভাবে নীল শাদায় ভাঙছে। বালির মধ্যে আধ-শোয়া হয়ে সেই হোলটাইম বিজনেস দেখছিলাম। কিছু কুলত্যাগী নুলিয়া আর নাগা নৌকো শিলুয়েটের মত স্কাইলাইটের অতিকায় পটে আঁকা। ব্রেকারের কাছে কিছু চপল স্নাতক কুমির-কুমির খেলছে, ঈষদ্দূরে কিছু বিহ্বল স্নাতিকা নুলিয়াদের ব্র্যাকেটে বাঁধা। কিছু বালিবিলাসিনী, কিছু রৌদ্র-রসিক, এবং কিছু তাপভোগী চিনি-মাখা 'টোস্টের মত বালিতে মাখামাখি হচ্ছে। অন্য দৃশ্যও আছে। শ্যাম্পুচুল রঙীন স্যাণ্ডুইচ্ টাইট হয়ে বসে দু'হাতে মধুর আলাপ ছড়াচ্ছে। এরই মধ্যে রয়েছে ক্যামেরার ক্লিক, ঝিনুক-রহস্য আর সফেন কিনারায় একটুখানি শাড়ি তুলে ধরে ক্ষণকালের হিরোইন।

হঠাৎ পিছনে খিলখিল হাসি শুনে চমকে তাকিয়ে যাকে দেখলাম, তাকে এখানে এ-পোশাকে দেখবো স্বপ্নেও ভাবিনি। দীর্ঘ পাঁচ বছরের অদর্শনের পর আমাদের চিরপুরাতন মৃগেন রায় সশরীরে আবির্ভূত, সঙ্গে সহাস্য সঙ্গিনী। মৃগেনের পরনে জাঙ্গিয়া-তুল্য শর্ট, গায়ে ট্রাইকলার জাম্পার, চোখে ইমপ্রেগ্নেবল্ গগ্লস্। তারই

কোনো প্রাইভেট রসিকতায় মেয়েটি ঢেউ তুলে হেসে ফেটে ছড়িয়ে পড়ছিল যেন।

আমাকে দেখেই মৃগেন মেয়েটিকে কি যেন বলে কয়েক কদম এগিয়ে এসে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়ালো।

'আরে, মৃগ, তুমি? একেবারে আপাদমস্তক বদলে গেছ যে!'

'তুই-ও কম যাস্নি কিন্তু—আপাদমস্তকই বলতে গেলে—মাথায় এ একখানা কি করেছিস?

সলজ্জ হেসে বললাম, 'টাক। বাট্ অ-ফুলি স্যরি!'

'শুধু কি টাক! ওই জয়ঢাকের মত ভুঁড়ি—ওটা চেপে যাচ্ছিস কেন, ত্রিলোচন। ক-বছর আগেও ছড়ির মত স্লিম্ ছিলি তুই, বেশ মনে আছে—'

মেয়েটি এতক্ষণ গম্ভীর হবার ভান করে দাঁড়িয়ে ছিল, এবার ঝিনুকের বোতামের মত গোলগোল একসারি দাঁত বের করে হেসে ফেলল। কার্টুনিস্ট ছাড়া আমার চেহারা দেখে সবাই হাসে। আমি একটু সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলাম, 'হ্যাঁ ঠিকই ধরেছিস, রিসেণ্ট্ ডেভেলপ্মেণ্ট!'

হঠাৎ সুর বদলে গেল মৃগেনের, বলল, 'তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, এই হচ্ছে অনীতা। আর ইনি, নাম শুনে আবার হেসো না যেন, ত্রিলোচন। কাগজে ফাগজে দেখে থাকতে পারো'—

অনীতা ফিক করে হেসে ফেলেই গম্ভীর হয়ে চোখ বড় বড় করে শুধালো 'আপনার বুঝি ছবি বেরোয় কাগজে?'

বড্ডই ছেলেমানুষ মেয়েটি, কুড়ি-একুশ বয়েস হবে যদিও। বেশ সরল হাসিখুশি মেজাজের, একটুতেই অবাক হয়।

একটা কমিক-মুখভঙ্গি করে বললাম, 'এই চেহারায়? ক্ষেপেছ। ভালো কথা, সমুদ্র কেমন লাগছে তোমার?'

'খু-উ-ব ভালো! আপনার?'

'আমার তো মুখস্থ হয়ে গেছে, দিনের পর দিন দেখেছি তো!'

'থাকবেন আরো? ওমা, কি মজা আপনার! আমরা কিন্তু কালই চলে যাব।'

আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তার আগেই মৃগেন ব্যস্তভাবে বলল, 'আচ্ছা এখন চলি, পরে দেখা হবে।'

হঠাৎ যেন টেলিফোন নামিয়ে রেখে কানেকশন কেটে দিল মৃগেন। মনে মনে আহত হলাম। এক সময় মৃগেন কেবল আমার সহপাঠিই ছিল না, বন্ধুস্থানীয় ছিল। তাবপর স্কুলে ও আটকে গেল আমরা বেরিয়ে গেলাম এক চান্সে, সেই থেকেই ছাড়াছাড়ি। কলেজ-জীবনে কি চাকুরি-জীবনে আর আমরা একসঙ্গে হইনি।

কিন্তু মৃগেনের বহুমুখী জ্ঞান আমাদের বরাবরই বিস্মিত করেছে। কলকাতার সিক্রেট লাইফ তার নখ-দর্পণে। হাইকম্যাণ্ড থেকে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড সব ওর জানা-চেনা। যে-কোনো প্রফেশনের টেকনিক্যাল টিট্-বিট ওর জিবের ডগায়। যাকে বলে ব্যাকডোর নলেজ তাতে ও মাস্টার। চোস্ত উর্দু বলতে পারে, ইংরেজি বলে অ্যাকসেণ্ট-মাফিক, মিথ্যে বলে আরো ফ্লুয়েণ্টলি।

বিকেলেই দেখা হয়ে গেল আবার। আমার পূর্বপরিচিত মিঃ নাগের ফ্যামিলির সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ধূসর রঙের স্যুটে ওকে দিব্যি স্মার্ট দেখাচ্ছে, বুকের কাছে টাইপিনের উজ্জ্বল কামড। মাথায় ক্রুকাট্।

মিঃ নাগ বললেন, 'আলাপ নেই তো? ইনি আমার মিসেস, এটি কন্যা, আর ইনি মৃগাঙ্কমৌলি রায়। স্টীম্ অ্যাণ্ড প্যাটেল কোম্পানির পার্চেজিং ম্যানেজার, শিগ্গীরই ফরেন যাচ্ছেন'—

মৃগেন সহাস্যে বলল, 'ত্রিলোচন আমার বাল্যবন্ধু, ও সব জানে।'

সব নিশ্চয়ই জানি না, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলতে পারলাম না। কারণ দু-চার কথায় বুঝতে পারলাম, নিজের কন্যার সম্বন্ধে ওকে পাকাপাকি মনোনীত করে ফেলেছেন নাগমশাই। মৃগেনের গুণে তিনি শুধু বিস্মিত নন, অন্ধও।

নাগমশাইরা, অনীতার কথা মত পরদিনই চলে গেলেন। কিন্তু আমার অনুরোধ ঠেলতে না পেরে মৃগেন এসে আমার বাসায় উঠলো। তারপর আর যাবার নাম নেই, দিন পনের থেকে গেল আমার কাছে। ছেলেবেলায়, 'ভ্যাট সিকসটি নাইন' যে পোপের টেলিফোন নম্বর ওর কাছ থেকেই জেনেছিলাম আমরা। এখন নিউক্লিয়ার রহস্য, স্পেস্ প্রবলেম ইত্যাদি ইত্যাদি আরও অনেক জ্ঞানলাভ করলাম। মৃগেন এখন মস্ত ব্যক্তি, রাইফেল শূটিং ক্লাব থেকে গল্‌ফ ক্লাব পর্যন্ত তার অবাধ গতিবিধি। ভালো রোজগার, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ; বিলেত যাবার আগে বিয়েটাও চুকিয়ে ফেলতে চায়। আমার সামান্য চাকুরি, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বন্ধু হিসেবে তাই বেদনাও পেল মৃগেন অবশ্যই।

তারপর মৃগেন একদিন চলে গেল। আবার সেই সমুদ্র, সেই মুখস্থ সমুদ্র আর আমি একা। খুব খারাপ ভাবে দিন-দুই কেটেছে এমন সময় একটি চিঠি এল, ছোট্ট চিঠি, হোটেলের ঠিকানা থেকে রিডাইরেকট হয়ে। মৃগেনের চিঠি। সে লেখেনি, তার বাবা লিখেছেন: স্নেহের মৃগেন, রেজাল্ট বাহির হইয়াছে, তুমি পাশ করিয়াছ। যদি কলেজে ভর্তি হইতে চাও সত্বর চলিয়া আইস। ইতি আশীর্বাদক তোমার হতভাগ্য বাবা।

কলঙ্ক

একের 'পর এক ভৃত্যকুলে যেভাবে আমাকে ত্যাগ করে গিয়েছে তাতে করে আমার মত ব্যাচিলারকে মেয়ে যদিবা কেউ সম্প্রদান করেন, চাকর দেবেন না এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। হীটারে সসপ্যান বসিয়ে আনাড়ি হাতে ওমলেট ভাজার চেষ্টা করতে করতে কথাগুলো ভাবছিলাম। এই বিদেশ বিভুইয়ে আফিস থেকে ফিরে এসে নিত্যদিন এই ছ্যাঁকাপোড়া আর যেন সহ্য হয় না। ধুত্তেরি! সামনের মাসেই দ্যুম করে একটা বিয়ে করে বসবো, মরিবাঁচি যা থাকে বরাতে!

এমন সময় দরজার পাশ থেকে প্রায় দৈববাণীর মত আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'কাজের লোক রাখবেন বাবু?'

ভগবান মাঝে মাঝে বুঝি এমনি করেই তাঁর দূতকে আমাদের দরজায় পাঠান। ওমলেটকে চুলোয় দিয়ে আমি সঙ্গে সঙ্গে দ্বারস্থ হলাম। প্রৌঢ় বয়সী লোকটি তার ময়লা জামাকাপড়ে হাতের ছোট্ট পুঁটলিটি নিয়ে আর একটু জড়োসড়ো হয়ে সরে দাঁড়ালো।

ক্ষিতিকে সেই প্রথম দেখলাম এবং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। না,

আমার সঙ্গে কিছুই মেলে না, দৈর্ঘ্যে নয়, প্রস্থে নয়, চরণযুগলেও নয়। আমার থেকে অন্তত দশ ইঞ্চি বেশী লম্বা, তিন ভাগের দুভাগ চিমসে, পদে পদে আরও অমিল। দেখে আশ্বস্ত হলাম। তা ছাড়া বয়স, এই বয়সের চাকর ইতিপুর্বে কখনোই রাখাব সুযোগ আসেনি। এই ধরনের সদ্য গড়ে ওঠা শিল্পনগরীতে কি রহস্যময় কারণে জানি না, চাকর মানেই অল্প বয়সী। হয় বালক নয় কিশোর নয়ত তরুণ যুবক। ব্যাচিলার কুঠি এখানে কম্ নেই, কিন্তু কোনো কুঠিয়াল সাহেবই তাঁর থেকে বেশী বয়সী কাজের লোক সংগ্রহ করতে পেরেছেন এমন দেখিনি।

অনেক ঠেকে ঠকে এবং ঘা খেয়েই তবে না এত কথা ভাবতে পারছি আজ। আমার চতুর্দশতম পুরুষ চাকরটি আমাব মাপে মাপে ছিল বলেই অনেক সুবিধে নিয়েছে। কিন্তু এত বোকা ছিলাম তখন কিছুতেই কিছু সন্দেহ করিনি। বাজার অঞ্চল থেকে দুদিন দর্জি এসে ফিরে গেছে, আমার মাপ নিয়ে যেতে পারেনি অথচ রবিবার ছাড়া আমার সময় হয় না। এবং রবিবারে সময় হলেও প্রায় রবিবারেই আমি এখানে থাকি না, বন্ধুবান্ধবদের কাছে বেড়াতে যাই। সপ্তাহ দুই পরে অফিস থেকে ফিরে দর্জি অভিসারে বেবোবো কিনা ভাবছি এমন সময় আমাকে আপাদমস্তক বিস্মিত করে দর্জি আমার স্যুট তৈরি করে হাতে হাতে ডেলিভারি দিতে এল। আমি তো তাজ্জব, নিজে মাপ দিয়ে বানালেও এত সুন্দর ফিট করেনি এর আগে কখনো। কি ব্যাপার?

অনেক পীড়াপীড়ির পর সে জানাল, আমার ভৃত্য রাজেন আমার হয়ে প্রক্সি দিয়েছে, শুধু মাপ নয় ট্রায়াল পর্যন্ত। রাজেনের ওপর বলা বাহুল্য সেদিন ক্রুদ্ধ হয়নি বরং এত প্রীত হয়েছিলাম যে, তক্ষুনি একটি টাকা ওকে বকশিস করে বসেছিলাম। কিন্তু সেদিন বুঝতে পারিনি রাজেনের এই উপস্থিত বুদ্ধি এবং আত্মবিশ্বাস কি থেকে জন্মেছে, আমার পুরানো স্যুট থেকে যে তার উৎপত্তি এবং নতুন স্যুটে তার বিনাশ, অনেক পরে তা জানা হয়েছে। সাদা বাংলায় বলতে হয় রাজেন

আমার অনুপস্থিতিতে অনেক দিন ধরেই আমার বেশভূষা ব্যবহার করে আসছিল। এবং সেই কারণেই সে নির্ভুলভাবে জানতো আমার বদলে সে মাপ দিলেও কিছু ইতর বিশেষ হবে না।

উইকএণ্ডে যথারীতি বেরিয়ে হঠাৎ একবার ফিরে এসেছিলোম কি কারণে যেন। তখন রবিবার বিকেল। সাধারণত শনিবারে যাই আর সোমবার একেবারে অফিস থেকে ফিরে আসি। রবিবারে ফিরে এসে দেখি রাজেন আমার স্যুটবুট পরে প্রসাধিত বদনে বেড়াতে বেরোচ্ছে। সঙ্গে দু'চারজন ফ্রেণ্ড।

সেই থেকেই চাকর রাখতে গেলেই আমি তার আপাদমস্তক একবার স্ক্রুটিনী করে নিই। অবিশ্যি সাইজে না মিললেই যে আপনি রেহাই পাবেন তারও কোনো গ্যারান্টি নেই, পরে জেনেছি। আমার শেষতম চাকর সেই দিব্যজ্ঞান আমাকে দিয়ে গিয়েছে।

জলধর এসেছিল, সত্যিই কাজেব ছোকরা। সেই সঙ্গে রুচি ছিল ছেলেটির। পিংপং বলেব মত লাফিয়ে লাফিয়ে তড়িঘড় কাজ করত। কিন্তু অতি পরিষ্কার, কোথাও ত্রুটি পাবেন না। বাজারের হিসেব মাড়োয়ারী গদীর পাকা খাতা লিখিয়ের মত এমন মিলিয়ে আনতো যে অনেক সময় মনে হত আগের দিন রাত্রেই বোধ করি লিখেটিখে পেপার ওয়ার্ক তৈরি করে রাখতো ছোকরা। মাখনের টিন, বিস্কুটের প্যাকেট অন্য চাকরের তুলনায় দ্রুত খালি করে আনতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে ছিল আমার গৃহিণীর অধিক। ঘর সাজাতে তার জুড়ি ছিল না, নিত্য নতুন ফুল কোথা থেকে যোগাড় করে আনতো সেও এক রহস্য ছিল। লাইব্রেরী থেকে বাছাই করে বাংলা বই এনে পড়াতো, খাবার সময় সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পীড়াপীড়ি করে খাওয়াতো, আড়ালে যাই করুক, প্রয়োজন হলে নিজের বাটির মাছটুকুও আমার পাতে পরিবেশন করতে দ্বিধা করতো না।

একদিন জানতে পারলাম জলধর শুধু শিল্পী নয় রসিকও বটে। পয়সা চুরি করুক যাই করুক, সে পয়সা বাজে নেশায় খরচা করে না। আমি ইংরেজি বাংলা দুটি সাপ্তাহিক রাখি। সেই হকারের কাছ থেকে

জলধরও নিজের পয়সায় একটি ঢাউস আকারের মাসিক পত্রিকা রাখে। শুনে চমৎকৃত হলাম।

কিন্তু চমৎকৃত হবার আরও বাকি ছিল যে! জলধর আমাকে ত্যাগ করে চলে যাবার বহু পরে জেনেছি, আমার পাড়ায় বহু দূরের কোয়ার্টার পর্যন্ত আমার খ্যাতি কি পরিমাণ ছড়িয়েছে। পাড়ায় আমার কারো সঙ্গে আলাপ নেই, বাইরে আচারে আচরণে আমি অত্যন্ত অমিশুক লোক, তার ওপরে ছুটির দিনগুলি কোয়ার্টারে থাকিই না। তদুপরি চারপাশে, এ পাড়ায় সবই প্রায় ফ্যামিলি কোয়ার্টার। বিশেষ করে নববধূর দল। তারা পর্দার ফাঁক দিয়ে আমাকে কেন বিলক্ষণ নজরে রাখে, তাদের অবসর মধ্যাহ্নগুলি পর্দানসীন হিরো-হিরোইন-কথার পাশাপাশি আমার উপকথা দিয়েও ভরপুর থাকে, এ সব ধীরে ধীরে জেনেছি। অনেকে অনেক কিছু ব্ল্যাক করে থাকে। ঝানু ব্যবসাদারের মতই, বহু অফিসার ঘর-ফেরতা জলধর তার বাবুকে এই স্ক্যাণ্ডালমংগার প্রতিবেশিনীদের কাছে ব্ল্যাক করে কি পরিমাণ পপুলার হয়েছিল ভাবলেও গায়ে কাঁটা দেয়।

আমার সম্বন্ধে কল্পিত কিসসা কাহিনী জলধর অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে ভৃত্য মহল মারফৎ চালান দিত। আমি জানতাম না আশে পাশে অনেক বাড়ির কিচেনে সরষের তেল রাখার জন্য যে সব হুইস্কি কিংবা জিনের বোতল ব্যবহৃত হচ্ছে সেগুলি আমার বাড়ি থেকেই গিয়েছে। জলধর কোথা থেকে এই বোতল যোগাড় করতো জানি না, কিন্তু দরাজহাতে সেগুলি সে কেন আমার কোয়ার্টার মার্কা দিয়ে বাজারে ছাড়তো সেটা বেশ অনুমান করতে পারছি।

তাই ক্ষিতিকে দেখে মনে স্বস্তি পেলাম। ক্ষিতি ঢিলে ঢালা বোকা-সোকা ধরনের মানুষ। স্ত্রী-পুত্র এবং জমিজমা খুইয়ে শেষ বয়সে চাকরি করতে এসেছে। এত দিন চালাকচতুর, ছটফটে, রীতিমতো স্যোশাল চাকর দেখে দেখে হদ্দ হয়েছি। তারা তিন সপ্তাহে ইংরেজি বোলচাল গলাধঃকরণ করে ফেলেছে, কেতাকানুন রপ্ত করে ফেলেছে। কিন্তু ক্ষিতি একেবারে উল্টো চরিত্তিরের মানুষ। লোকজন এলে সে

এমন লজ্জিত মেয়েমানুষের মত ব্যবহার করে যে কী বলব। কোনো বন্ধু-পত্নীটত্নী এলে ক্ষিতির ধরণী দ্বিধা হও অবস্থা। কপাটের আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে একটু দেখে চোখাচোখি হলেই জিভ কেটে আরও গভীরতর আড়ালে সরে যায়।

এই সামান্যতম কৌতূহলটুকু না থাকলে ক্ষিতিকে এক রকম বৈরাগীই বলা চলত। সংসারে সে উদাসীন ধরনের মানুষ, টাকাপয়সা সম্বন্ধে আবো খেয়াল-ক্যাপা। মায়া-মমতা নেই। হিসেব-টিসেব মাথায় ঢোকে না। বাজারে পাঠালে একেবারে দিশে-হারা হয়ে পড়ে। আসলে মাথায় খাটো, বুদ্ধিবৃত্তি বাল্যকালের পর থেকে বোধ হয় একদম বাড়েনি। ভীষণ ঢিমেতালে কাজকর্ম করে, ‹ন্তু কুঁড়ে নয়। আসলে ভেবে চিন্তে কোনো কাজ করতে পারে না; তাই এত স্লো। কিন্তু তবু বলব, ক্ষিতি খাটি মানুষ। ছল ছুতো জানে না।

আগের দিনে হলে তেরাত্তির পোহাতো না হয়ত, ক্ষিতিকে আমি নিঃসন্দেহে বিদায় করতাম। কিন্তু অনেক ঠেকে এবং ঘা খেয়ে আমার শিক্ষা হয়েছে, ক্ষিতিকে পেয়েই আমি যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। ক্ষিতি আমাকে সুখে রাখেনি ঠিকই স্বস্তিতে রেখেছে। মস্তিষ্কহীন নির্বোধ মানুষ যে এত ভালো হয়, 'কেষ্টা'র পরে ক্ষিতিই বোধ হয় তা দ্বিতীয়বার প্রমাণ করল।

শনি রবিবার বাইরে কাটিয়ে সে দিন যথারীতি সোমবারে অফিসে এসেছি। আমার এক পুরনো সহকর্মীর সঙ্গে দেখা। তিনি বেজায় খাপ্পা হয়েছেন আমার ওপর। অনেক সাধাসাধির পর তাঁর গোঁসার কারণটা খোলসা করলেন আমার কাছে। আমার বাড়ি থেকে তাঁর বাড়ির দূরত্ব প্রায় মাইল তিনেক। শনিবার-দিন রাত দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে আমার কোয়ার্টার থেকে হেঁটে হেঁটে বাড়ি ফিরে এসেছিলেন ভদ্রলোক। রবিবার সকালে আবার হানা দিয়েছিলেন, কিন্তু সেবারও অ:ম্লর জন্য আমাকে মিস করায় নিরুপায় হয়ে চিঠি লিখে এসেছিলেন। কিন্তু এত সত্ত্বেও আমি তাঁদের বিবাহ বার্ষিকীর নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করেছি, এ দুঃখ তিনি নাকি জীবনে ভুলতে পারবেন না।

আমি অবাক হয়ে জানতে চাইলাম আমার চাকরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল কিনা। আমার সহকর্মী ক্ষিতির ভূয়সী প্রশংসা করলেন। ক্ষিতি কিভাবে তাঁকে বার বার চা দিয়ে খবরের কাগজ দিয়ে আপ্যায়ন করেছিল, আর একটু বসুন আর একটু বসুন, বাবু এক্ষুনি এসে পড়বেন বলে ধরে রেখেছিল, উচ্ছসিত হয়ে সে কথা বললেন। অত রাত পর্যন্ত আমি না ফেরায় ক্ষিতির দুঃশ্চিন্তা পর্যন্ত নাকি বেশ বোঝা যাচ্ছিল

আমি কিছু বললাম না। ক্রোধে ক্ষোভে ফুলতে ফুলতে বাড়ি ফিরলাম। আমার বন্ধুজনের সঙ্গেও নির্বোধ ক্ষিতি তামাশা করার স্পর্ধা এবং সাহস কোত্থেকে পেলো ভেবে পাচ্ছিলাম না। ক্ষিতিকে সামনে পেয়েই একচোট নিলাম। বললাম, 'তোমাকে বলে গেলাম পর্যন্ত যে সোমবার রাতের আগে ফিরবো না, তবু তুমি ভদ্রলোককে জেনে শুনে হয়রানি করলে কেন বলো।'

ক্ষিতি মাথা হেঁট করে দরজার পাশে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল। তা দেখে আমার মাথায় আরো খুন চেপে গেল। চীৎকার করে বললাম, 'বলো, জবাব দাও'—আধ ঘণ্টা বকাবকি করার পর ক্ষিতি অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে ক্ষীণকণ্ঠে যা বলল, তার সার মর্ম এই যে, আমি যে মাঝে মধ্যেই রাতে বাড়িতে থাকি না, মানে বাইরে রাত কাটাই, সে কথা প্রাণ থাকতে ক্ষিতি বাইরের লোকের কাছে কি করে প্রকাশ করে?

চরিত্র

সব নিজের হাতে করা

'পিতাকা পুত্র সোলজারকা অশ্ব' —নবেন্দুই রসিকতা করে বলত কথাটা। কথাটা কিন্তু নবেন্দুর বেলাতেই খাটেনি, অথবা বিপরীত অর্থে খেটেছে, আমরাই বুঝতে পারিনি। নবেন্দু এবং নবেন্দুর বাবা ছিলেন পরস্পরের একেবারে সর্বতোভাবে বিপরীত। দেহে মনে চরিত্রে। যুক্তভার্বে তাদের দেখলে ইংরেজী সিক্সটি-নাইন রূপী পেয়ার বলে মনে হত। একেবারে আপাদমস্তক ফারাক, সোজা পড়লেও যা ওল্টালেও তাই। যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপান্ন নয়!

আঠারো ঘণ্টার কট্ঠর কর্মী নবেন্দুর বাবা, মাত্র বিশ বছরে একার চেষ্টায় বিরাট ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন, প্রাসাদোপম বাড়ি করেছেন, খান দুই গাড়িও। কিন্তু এখনো নিজের জুতো নিজে পালিশ করেন, নিজের দাড়ি নিজে কামান্ নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করেন। এবং নিজের ছেলেকে অদ্যাবধি নিজে চালান। সে এক গল্প, কিন্তু তার আগে তাঁর মধ্য বয়সের একটি কাহিনী ছোট্ট ট্যাবলেট আকারে শুনে রাখুন।

একবার এক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক তাঁকে অপমান করায় তিনি

নিজে হাতে এর শোধ নেবেন বলে শাসিয়ে এসেছিলেন। যে কথা সেই কাজ। পরদিবস থেকেই দুবেলা ডন-বৈঠক শুরু করে দিলেন। কাঁচা ডিম, বাদামের সরবৎ আর ছোলা, গুড় সহ। কর্তার কাণ্ড দেখে গৃহিণী স্তম্ভিত হলেন, ছেলেমেয়েরা কৌতূহলে রোমাঞ্চিত। তাঁর লোকজন প্রহরে প্রহরে বদমাশটার হালহদিশ আনছে, একজন তো রাজধানীতে রওনাই হয়ে গিয়েছে তাঁর ফরমাশ মাফিক লোহার চাবুক কিনে আনতে। লড়াইয়ের দিনক্ষণ স্থির। সে এক দারুণ ঘরোয়া উত্তেজনা ; যেন টোটাল ওয়ারে নেমে পড়েছেন কৃষ্ণেন্দুবাবু।

সপ্তাহান্তে বহুজন-প্রতীক্ষিত সেই দিনটি এল। যথাসময়ে তিনি চাবুকটি কোমরে ঝুলিয়ে বাড়ির উঠোনের নারকেল গাছটিতে আরোহণ করলেন। গাছটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হেলে প্রাচীর পেরিয়ে একটি টিনের চালের ওপর হুমড়ি খেয়েছে। তিনি গাছ থেকে চালের ওপর লাফিয়ে পড়ে, তারপর সড়সড়ি খেয়ে পথে নামলেন। অনেক তকলিফ্ হল, তা হোক। বাধা না পেলে কোন্ লঙ্কাকাণ্ডটাই বা হয়? হনুমানকেও তো লাফাতে হয়েছিল তজ্জন্য!

বলা বাহুল্য, অবলীলায় শত্রু শায়েস্তা করে কৃষ্ণেন্দুবাবু বীরদর্পে ঘরে ফিরে এসেছিলেন এবং বাকি জীবনের মত ডন বৈঠক আর কাঁচা ডিমের ছুটি মঞ্জুর করেছিলেন। কিন্তু সেই থেকে ব্যায়ামের প্রতি একটা স্থায়ী শ্রদ্ধা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রইল। ফলে বড় ছেলে নবেন্দুর ওপরে অনিবার্য এক্সারসাইজ রুল জারি করলেন, ডাম্বেল-বারবেল-মুগুর কেনা হল। কয়েক মাস পরে রঙ্গস্থলে সারপ্রাইস ভিজিট দিতে গিয়ে নিজেই বেমালুম চমকালেন। দেখলেন বাড়ির হিন্দুস্থানী চাকরটি গলদঘর্ম হয়ে ব্যায়াম করছে, আর নবেন্দু আয়েস করে বসে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। মনের ব্যায়াম, নিদেনপক্ষে চোখের ব্যায়াম হবে এই বিশ্বাস নবেন্দুর ছিল। সেদিন অবশ্য কানের ব্যায়ামও হলো। রীতিমত কর্ণগোচর করে পিতৃদেব বুঝিয়ে দিলেন যে, যত সামান্যই হোক স্বহস্তে কিছু করার তুলনা হয় না। ইনসট্রুমেন্ট না পোষায় ফ্রি-হ্যাণ্ডও কিছু খারাপ না।

কলেজ জীবনে এই নবেন্দুর সঙ্গে আমার আলাপ এবং তৎক্ষণাৎ গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তার মত সুখী আর সৌখীন ছেলে আমি আর দুটি দেখিনি। নবনী-মার্কা চেহারা ফুলোফুলো গাল ঢিলেঢালা ফিনফিনে পোশাক। মেয়েরা যেভাবে মুখে পাউডার পাফ্ বুলোয় তেমনি আলতোভাবে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতো। থেমে থিতিয়ে কথা বলত, আলগোছে হাঁটতো, যেন পৃথিবীতে কোথাও কোনো তাড়া নেই, কোথাও কখনো দেরি হয়ে যায়নি, এমনি নিশ্চিন্ত আলস্য। পায়ে কাজকরা একজোড়া চটিজুতো, হাতেও প্লাস্টিকে মোড়া একখানা চটি খাতা। ব্যস এই লিখে-পড়ে সে কলেজে চতুর্বর্ষ কাল কাটিয়ে দিল। কোনো কায়িক পরিশ্রমের জন্যে যে তার জন্ম হয়নি, এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম।

ফলে দীর্ঘ চার বছর নবেন্দুর যাবতীয় নোট আমরা করে দিয়েছি। একমাত্র পরীক্ষার খাতায় ছাড়া সে স্বহস্তে কিছু করেনি। বাল্যকাল থেকেই বোধ হয় এইভাবে চলে এসেছে, ফলে নিজের হস্তাক্ষর দেখে নিজেই অনেক সময় চমকে উঠতো, সঠিক চিনতে পারতো না। একজন অধ্যাপক একদিন ওকে ডেকে শুধিয়েছিলেন 'এ সব নিজে লিখেছ, না কালিতে আরশোলা ডুবিয়ে খাতার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলে হে?'

বাড়িয়ে বলেন নি অধ্যাপক, হরফগুলো শুধু দৃষ্টিকটু ছিল তাই নয়, সাইজেও বিস্তর গোলমাল ছিল। পাশাপাশি সংলগ্ন দু'টি অক্ষরকে দেখলে মনে হত, আঁকাবাঁকা রাস্তায় গ্র্যাণ্ড ফাদারের হাত ধরে দুবলা নাতি হাঁটছে টলমল পায়ে।

ফোর্থ ইয়ারের শেষ দিকে নবেন্দু যখন অভ্রান্ত রকমে প্রেমে পড়ল তখন তার চিঠিগুলো আমাকেই লিখে দিতে হত। নবেন্দুর ফরমাসে প্রত্যেকটি চিঠি দু'খানা করে লিখতাম, না, ফাইল-কপি রাখার জন্যে নয়, বর্তমান 'ঠিকানা' যদিই দৈবক্রমে মিস্ হয়, অন্য মেয়েকেও নবেন্দু তার ওল্ড স্টক থেকে স্বাধীনভাবে এই সব কূটনৈতিক নোট পাঠাতে পারবে। প্রেমপত্রে নাকি তারিখ আর নাম লিখতে নেই, সুতরাং কত সুবিধে।

ফাইনাল পরীক্ষার পর ছটি মাস শয্যাগত ছিলাম, ওর খবর রাখতে পারিনি। দেখা হতেই শুধালাম, 'কি রে, কেস্ কদ্দুর এগোলো?'

'কানেকশন কেটে দিলাম।'

'সে কি! কি হয়েছিল?'

উদাস গলায় নবেন্দু বলল, 'তুই কেটে পড়লি, অগত্যা—। এ সব চিঠি ত হাত-বদল করে লেখা চলে না। অবিশ্যি শেষ চেষ্টা করেছিলাম। শ্যালদা থেকে একটা চিঠি বাংলায় টাইপ করিয়ে ছেড়েছিলাম। কিন্তু সেটা পেয়ে ও ছ' পাতা হেসে চিঠি লিখলো। প্রেমের ব্যাপারে ঠাট্টা অসহ্য, ছেড়ে দিলাম। টেলিফোনে আর-একজনকে কানেক্ট করেছিলাম। কিন্তু তুই তো জানিস, কোনো ফ্যাচাং আমার সহ্য হয় না। ছেলেরা মাইলের পর মাইল কি করে যে হাঁটে আর আলতু-ফালতু বকে, তীর্থের কাকের মত প্রতিদিন ল্যাম্পপোস্টে হেলান দিয়ে ঘণ্টা-ভর দাঁড়িয়ে থাকে, আমি ভাবতেই পারি না। টেলিফোনে কল্ করাই, আমার পোষালো না!'

'টেলিফোনে আবার কি ফ্যাচাং হলো,'

'বলিস না! মেয়েরা আসলে বড্ড ন্যাকা হয়, দরকারী কথা মোটে কানে নিতে চায় না। সন্দেহ হলো টেলি-ফোনে ক্যাচ করা মাত্তর ও গলা বদলে নিজের ছোটবোন ব'নে যায়, বলে ধরুন ডেকে দিচ্ছি। মিনিট পাঁচেক উলটুল বুনে ফের ন্যাকা গলায় বলে, হ্যালো, আর একটু কষ্ট করে ধরে থাকুন লক্ষ্মীটি, দিদি না বাথরুমে গিয়েছেন, বেরুলেই—। বোঝ! টেলিফোন বুথে মিনিটের পর মিনিট পাবলিকলি কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকা, উফ্! পোষালো না।'

শেষ ঘটনাটুকু লোকমুখে শোনা। ফুলশয্যার রাত পোয়াতে না পোয়াতে নবেন্দুর বউ সাতঙ্কে দেখলো তার স্বামী বিছানায় নেই, ঘরের মধ্যেও কোথাও চিহ্ন দেখতে না পেয়ে ভেজানো দরজা ঠেলে বাইরে বেরিয়েই আঁতকে উঠলো। বারান্দার ওপর উপুড় হয়ে নবেন্দুর লাস পড়ে আছে, সে চেহারা একমাত্র স্ত্রী ছাড়া কারো পক্ষে

সনাক্ত করা শক্ত। কটিদেশে ক্ষাণতম একটি জাঙিয়া ছাড়া আততায়ীরা সর্বাঙ্গে দ্বিতীয় কোনো বস্ত্রখণ্ড রেখে যায় নি, করতল মেঝের ওপর, কনুই দু'টো পাখির ডানার মত উঁচনো রয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায়, আঘাত খেয়ে মাটিতে পড়ে যাবার পরও নবেন্দু উঠে বসবার শেষ চেষ্টা করেছিল। গা পাথরের মত ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ পড়ে রয়েছে!

নতুন বউ ট্রেনের হুইসেলের মত একখানা মর্মভেদী চিৎকার দিতে বাড়িসুদ্ধ লোক বারান্দায় বেরিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালেন। নবেন্দু হাই তুলে ধীরে ধীরে উঠে বসলো। কৃষ্ণেন্দুবাবু হুঙ্কার ছাড়লেন, 'উদোম হয়ে এ কি ব্যাপার?'

'ফ্রী হ্যাণ্ড করছিলাম।' নবেন্দু সবিনয়ে জানালো।

ডন দিতে গিয়ে হাত কমজোরি হওয়ায় শুয়ে পড়েছিল নবেন্দু। ঠাণ্ডা পাথরের মেঝেয় বেশ আরাম লাগছিল। ফুরফুরে ভোরের হাওয়ায় কয়েক মুহূর্ত পরেই উঠে পড়ার সদিচ্ছা নিয়েই বুঝি চোখ বুজেছিল। তারপরে আর কিছু জানে না।

টেক্কা

লম্বা ছিপছিপে চেহারা। কৌতূহলী ভ্রূযুগলের নীচে ফ্রেমে ঘেরা একজোড়া সপ্রতিভ চোখ, কিন্তু মুখশ্রী বড়ই গম্ভীর। ধীর গলায় কথা বলেন। এই হচ্ছেন জ্ঞানমামা, যাঁকে কোনোদিন আমরা মুখফুটে হাসতে দেখিনি, অথচ যিনি মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সকলকে হাসিয়ে গিয়েছেন। জ্ঞানমামা দুবার ভ্রূ নাচালেন কি একবার হাত নাড়লেন কিংবা দু অক্ষর কথা বললেন, গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখলেন অথবা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন—সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝে নিতাম জ্ঞানমামা কিছু হাসির প্যাঁচ কষলেন। সে বয়সে সব বুঝতাম না, শুধু এইটুকু বুঝতাম যে, রসার্থক বাক্য এবং রসাত্মক কর্ম ছাড়া জ্ঞানমামা নেই। তিনি যা করেন, বলেন এবং লেখেন তার মজ্জায়-মজ্জায় হাসি, তবে সে হাসির গায়ে কোথাও 'হিউমার' লেখা লেবেল নেই, ফুট-নোট নেই, টীকা ব্যাখ্যা নেই, যে বুঝলো সে বুঝলো। জ্ঞানমামা দ্বিতীয়বার আর সেটা রিপিট করবেন না, খ্যাঁঃ খ্যাঁঃ করে হেসে হাসির খেই ধরিয়ে দেবেন না, ততোধিক গম্ভীর মুখ করে অন্তরে হাসতে হাসতে চলে যাবেন মাত্র।

একদিন কটকের বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন জ্ঞানমামা, তাঁর পরিচিত একটি লোক হরিণের শিশু হাতে নিয়ে ফিরছেন দেখতে পেলেন।

ভদ্রলোক তাঁকে ছাড়িয়ে যেই অনেকটা এগিয়ে গিয়েছেন অমনি জ্ঞানমামা তাঁকে নাম ধরে ডাকলেন এবং বাজারসুদ্ধ লোককে শুনিয়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন 'মশাই ও শিঙ্ কার?'

'কার আবার হবে, আমার।'

'অ্যাঁ, আপনার! অ্যাদ্দিন দেখিনি কেন?'

"বাঁধাতে দিয়েছিলুম যে' সরল বিশ্বাসে কৈফিয়ত দিলেন ভদ্রলোক।

'অঃ তাই বলুন!'

এ দিকে জ্ঞানমামাব বলার ভঙ্গিতে আশপাশের দু'চারজন রসিকতাটা ধরে ফেলে সরবে হেসে উঠেছেন ততক্ষণে। ভদ্রলোক তা দেখে ঈষৎ অপ্রস্তুত হয়ে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিলেন হনহন করে।

দাঙ্গার পবে পরেই একদিন বিকেলে জ্ঞানমামা ভুলে কলাবাগান বস্তির পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। বস্তির কাছে এসেই হঠাৎ সঙ্গেব সহকর্মীকে বললেন, 'সর্বনাশ! মশাই দেখছেন কি, তাড়াতাড়ি হাত মুঠো করুন'—

'হাত মুঠো করবো! কেন কি হয়েছে?' ফ্যাকাশে মুখে ভদ্রলোক শুধালেন। এ পথে ফেরা যে কত বড় বিপজ্জনক হয়েছে তিনিও তা ততক্ষণে আঁচ করেছেন।

জ্ঞানমামা নিজের একটি হাত মুঠো পাকিয়ে বললেন, 'কোনো কথা নয়, প্রাণে বাঁচতে চান তো হাত মুঠো করুন।'

ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে হাত মুঠো করলেন এবং দু'জনেই নিঃশব্দে হেঁটে চললেন। নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে মামা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এবার মুঠো খুলুন।'

ভদ্রলোক বারবার হাত মুঠো করার কারণটা জানতে চান কিন্তু মামা কোন উত্তরই দেন না।

'ব্যাপারটা কি মশাই? বলুন না, চেপে যাচ্ছেন কেন?'

'অতি সহজ ব্যাপার, চেপে যাবার কি আছে! এতক্ষণে আমরা প্রাণ হাতের মুঠোয় করে এলাম, এটাও বোঝেন নি?'

একবার থিয়েটার দেখতে গেছি মামার সঙ্গে। ইনট্যারভেলের পর ভেতরে এসে দেখি একটি বেরসিক লোক মামার আসন দখল করে বসে দিব্যি ঘস্‌ঘস্‌ করে পান চিবোচ্ছে। যতই সরে বসতে বলা হয় কিছুতেই কথা কানে তোলে না। মামা আর কোনো শব্দ করলেন না, লোকটিকে মাঝখানে নিয়ে অগত্যা আমরা দু'জন দুপাশে বসলাম। মামা নিশ্চয় কোনো একটা কাণ্ড বাধাবেন, এ আমি জানতাম। প্রেক্ষাগৃহে অন্ধকার হল, প্রাক্তন অভিনেতারা আবার স্টেজে ফিরে এলেন, অডিটোরিয়াম নিঃশব্দ।

'আরেব্বাস্‌। একি' একি অ্যাঁ!' আমাদের মাঝখানের লোকটি ভয়ার্ত গলায় সমানে বলতে থাকেন।

মামা নিচু হয়ে কি যেন করছিলেন, নিরীহ গলায় বললেন, 'থামুন মশাই, আমার পা চুলকোচ্ছি তাতে আপনার কি হয়েছে?'

'উঃ! এ যে আমার পা, চোখের মাথা খেয়েছেন? আঃ লাগে, ছাড়ুন'—

মামা লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন 'ওঃ কি কাণ্ড দেখুন তো, ভাগ্যিস আপনি বললেন, এই অন্ধকারে কি কারো পা চেনা যায়!'

সেই ওষুধে অবশ্য ফল ফলেছিল, দ্বিরুক্তি না করে লোকটি সরে বসেছিল তৎক্ষণাৎ।

একবার ট্রেনের কামরায় সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন একটি পরিবারের যন্ত্রণায়। কামাখ্যা থেকে তাঁরা ফিরছেন একথা জানতে কারো বাকি নেই। প্রায় লাউড স্পিকারের মত গলায় হেড অব দি ফ্যামিলি নন-স্টপ্‌ বকে চলেছেন ঘণ্টা তিনেক ধরে। বিষয়বস্তু কামরূপ কামাখ্যায় দ্রষ্টব্য বর্ণনা। মামা বাঙ্কের ওপর থেকে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হলেন শেষ পর্যন্ত। ভদ্রলোকের মুখোমুখী বসে গালে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ তাঁর কথকতা শ্রবণ করলেন। তারপর ফিসফিস করে বিস্ময় ভরা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কোন্‌ কামাখ্যার কথা বলছেন? সেই বিখ্যাত কামরূপ কামাখ্যা? বলেন কি!'

ভদ্রলোকের বক্তৃতার তাল কেটে গেল। কণ্ঠস্বরের স্কেল চেঞ্জ

ক'রে তিনি সগর্বে উত্তর দিলেন, নিশ্চয়ই ! সেই বিখ্যাত কামাখ্যা'—

মামা বাধা দিয়ে বললেন 'কিন্তু সেখানে গেলে যে শুনেছি মানুষ কি সব ভেড়া-টেড়া হয়ে যায় ? আমি তো সেই ভয়েই আজ পর্যন্ত'—

থ্যাক্ থ্যাক্ করে ভদ্রলোক করুণার হাসি হাসলেন, 'ওসব অন্ধ কুসংস্কার'—

মামার কিন্তু কিছুতেই প্রত্যয় হতে চায় না, ভদ্রলোকের মুখচোখ হাত পা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করেন, 'আমাকে ছুঁয়ে বলুন তো দাদা, আপনার শরীরে মনে কোনো রকম পরিবর্তন-টরিবর্তন বোধ করছেন, কিনা ?'

'ধ্যুর্ মশাই কি যে বলেন, এই বিজ্ঞানের যুগে—হ্যাঁ, পরিবর্তন বলতে কি মীন করছেন ?'

কম্পার্টমেণ্টের সবার চোখে চোখ বুলিয়ে নিয়ে মামা বললেন, 'এই ধরুন চপ-কাটলেট কি মিষ্টান্ন খেতে অরুচি কিংবা কচি ঘাস-টাস দেখলে মন কেমন করা···এই সব আর কি !'

'নেভার !' ভদ্রলোক যেন দম্ভোক্তি করলেন, 'আমি কখনো ওরকম বোধ করি না।'

'স্ট্রেঞ্জ ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ !!' মামা জানলার দিকে মুখ করে ঘুরে বসলেন।

হাতযশ

উচ্চপদস্থ অফিসার মাত্রেরই নামে বাজারে যে আগমার্কা দেওয়া কেচ্ছা চালু আছে, সে কথা আপনিও জানেন, আমিও জানি। যাক সে কথা!

জেলা সদরে নাজির মশাই হচ্ছেন গাড়ি-বরদার। সরকারী অফিসারদের তিনিই জীপ বার করে দেন। স্লাইট খচাখচি থাকলে এমন গাড়ি আপনার নামে তিনি বরাত করবেন যে সারপ্রাইস ভিজিটটা আপনার শিকেয় উঠবে। বেকা মাঠের মধ্যে আপনার গাড়ি বে-আদপ গাধার মত চার চাকা খিঁচে দাঁড়িয়ে পড়বে। তখন ড্রাইভারকে স্বস্থানে বসিয়ে সাকুল্যে তিন কিলোমিটার হয়ত আপনাকেই ঠেলতে হবে। এমনি ধারা ব্যাকিং ছাড়া আজকাল অধিকাংশ গাড়িই অচল। গাড়িরও নিজস্ব কোনো দোষ নেই. জন্তুই হোক আর যন্ত্রই হোক তারও তো জান বলে একটি পদার্থ আছে। আমেরিকার খারিজ বাতিল চার চাক্কেবালা একটানা কুড়ি বছর দৌড়েছে স্বদেশী খানায় খন্দে রাজপথ নামক বেহেস্তের পথে এবং চার চারটি ইলেকশন সার্ভিসে (অর্থাৎ চাকাপিছু একটি করে)। ফলে কোনোটার হর্ণ বাজালে মনে হয় তার ফ্যারিনজাইটিস আছে। কোনোটার ক্লাচ ধরে না, ব্রেক বসে না

গীয়ার বদল নেয় না, ফুয়েল অয়েল অবধি রিফ্যুজ করে বসে। হেডলাইট বেহেড হয়েছে কারো, কেউ কেউ পথচারীর দিকে একচোখের টিপস ঝাড়ে, প্রতিবার স্টার্ট নেবার আগে কেউ হুপিং কাশির মত মুখ চোখ লাল করে কয়েক সীরিজ কাশে। এ দিকে বুকের ভেতর হয়ত কুলীন পার্টসের চতুর্থ পক্ষ চলেছে, নম্বর ছাড়া তামাম খোলনলচেই বদলে গেছে কোনো গাড়ির। কিন্তু এই বাহু! আপনার নার্ভ ড্যামেজ করে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নীট ওজন পাউণ্ড ছয়েক কমিয়ে এমন কি ক্যারেকটার পর্যন্ত যদি বদলিয়ে দিতে চান তাও পারেন নাজিরবাবু। তিনি জানেন ড্রাইভার যদি সরব হয় তার চেয়ে বিপজ্জনক বস্তু আর হয় না বিশেষ করে সেই ড্রাইভার আবার যদি হয় স্ক্রু-ড্রাইভার। সিড়িঙ্গে চেহারা সিঙ্গিমাছের মত গায়ের রঙ এবং মুখের কাট (কানকোর কাছে উঁচোনো কাঁটার মতই কোনো উঁচোনো চোয়াল) গালের ভস্ম বর্ণে যেন ছাইগুঁড়ো পাউডার মাফিক ছড়ানো, অর্থাৎ বিন্দু-বিন্দু মানে ফুটকি-ফুটকি পাকা দাড়ি। চোখে চশমা খাঁড়ালো নাক, ব্রোঞ্জ-বিবস মুখশ্রী। স্ক্রু-ড্রাইভার-এর আসল নাম অক্রুর ড্রাইভার। লোকের মুখে মুখে সরস সঙ্কেতের মত বেঁকেচুরে স্ক্রু হয়ে গিয়েছে।

গাড়ি চালাতে বসলেই নিজের অলিখিত আত্মজীবনী বিলকুল বকে চলে অক্রুর, কারো হুঁ হাঁর ওয়াস্তা রাখে না। স্বগতোক্তি-সংলাপ-একবাচন-খেউড়-সুবচন সমস্ত কিছু পাঞ্চ হয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে। মনে হয় কথার স্রেপ কুলকুচো করছে অক্রুর। জীবনে কম লোককে তো চড়ায়নি সে, চালনা করেনি খুব কম লোককে! তাঁরা অনেকেই ছিলেন মেজাজমর্জিতে নির্ভুল সাহেব। আগেকার দিনের বাঘা বাঘা আই সি. এস. অফিসার সব। তাঁদের সমান আসনে পাশে বসে গাড়ি চালিয়েছে সে, সাহেবদের নাড়িনক্ষত্র জানা ছিল তার। চাবুকের মত ছিল ইংরেজি বোল-চাল, কথায় কথায় হুকুম-হুমাক সবুট-দাপট, তেমনি আবার খানদানী রসজ্ঞান। বুনো বাংলোগুলোয় তখন ফুর্তির ফোয়ারা বইতো। আজকের মিয়োনো মুড়ির মত নিরামিষ অফিসাররা

টি. এ. বাঁচাতেই ব্যতিব্যস্ত, স্বপাকে-দুর্বিপাকে কোনো রকমে 'টুর' সম্পন্ন করেছেন, প্রতিবাদে থমকে গিয়ে যাঁরা বাড়ি ফিরে আইনের বইয়ের পাতা উল্টে ল-পয়েন্টের হদিস খোঁজেন ডিক্সনারী দেখা ছাত্রের মতন—তাঁরা হয়ত অক্রুরের মহাপ্রভুদের উপ-কাহিনী রূপকথা বলেই ভেবে নেবেন।

আসলে এ বুঝি এক ধরনের ম্যানসিক টর্চার। পাশে বসে থাকা ডেপুটিরা নিরুত্তর যন্ত্রণায় ভোগেন। অক্রুর কাউকে যেন আমলের মধ্যেই আনতে চায় না, সাহেব বলে পুরোপুরি মানতে চায় না। বিড়িটা সিগারেটটা সামনে খায় না বটে, এবং সম্বোধনে ছ্যার (স্যার) বলে থাকে, কিন্তু কথায় মুখের আগল প্রায় অনেক দিন ঘুচিয়েছে। সেই কারণেই পাশে নিঃশব্দে বসে থাকা প্রায় দুঃসহ হয়ে দাঁড়ায়। কোন্ অ্যাডি-শন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট চলে যাবার সময় অক্রুরকে সাড়ে সাত সেরী দুধেলা গাই উপহার দিয়ে গিয়েছেন, কোন্ ম্যাজিস্ট্রেট গিন্নী তাকে মাসে একবার নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন, দিনের পর দিন এই কাহিনী শুনতে হয় সবাইকে। কিন্তু দুটো কারণে অক্রুরকে অফিসাররা কেউ ঘাঁটান না। নিজের গাল-গলা নাপিতের ধারালো ক্ষুরের তলায় সমর্পণ করে যেমন কেউ তাকে চটায় না, টুরে বেরিয়ে তেমনি ড্রাইভারকে চটাতে নেই। বিশেষতঃ অক্রুরের মত বেপরোয়া গাড়ি চালককে। তার একেবারে মিলিটারী মেজাজ, কেউ সাইড না দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কেউ ওভারটেক করতে গেলে যে কোনো রকম অ্যাকসিডেন্ট করতে সে প্রস্তুত। প্রায়ই সে বাস কিংবা লরীর সামনে নিজে গাড়িখানাকে আড় করে দাঁড় করিয়ে বুলেটের মত নেমে যায় এবং ড্রাইভারদের ধরে নিয়ে এসে হুজুরে হাজির করে। সামনে কোনো বেতালা পথচারী পড়লে হর্ন দেয় না অক্রুর, স্রেপ তার নিতম্ব ছুঁয়ে এমনভাবে ব্রেক কষে যে সেই চমকানি তার সারা জীবন মনে থাকবার কথা।

নিজের স্ত্রী এক্ষুনি-এক্ষুনি বিধবা হোক কোনো স্বামীই বোধ হয় এটা চায় না। তাই একজন সত্ত বিবাহিত অফিসার পরিণাম না

ভেবেই ধমকে দিয়েছিলেন অক্রুরকে, ভালোমন্দ অ্যাকিসেডেন্ট একটা ঘটে গেলে তখন কে সামলাবে!

'আমি সামলাবো, ছ্যার,' লাল লাল চোখ মেলে শয়তানের মত হেসে উঠল অক্রুর, 'মিলিটারীতে ক্যায়সা ট্রাক চালাইছি যদি দ্যাখতেন'—

তারপর আর বাড়তি কথা বলেনি শুধু রানিং কমেনটরি ছাড়া। মাইল দশেক রাস্তা মিকশ্চারের শিশির মত জীপখানাকে ডাইনে বাঁয়ে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে নিয়ে এসেছে। পথের ধারের বড় বড় গাছের গুঁড়ি ছুঁয়ে, সামনে পড়া ট্রাক আর বাসের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে মারাত্মক চেহারার পেট্রল ট্যাঙ্কারের অ্যাবডোমেন ছুঁয়ে মাতালের মত ফুল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছিল অক্রুর। কিভাবে অ্যাকসিডেন্ট হয় কি ভয়ানক কাণ্ড এক্ষুনি চোখের পলকে ঘটে যেতে পারতো। এক সুতো মার্জিন রেখেও কিভাবে বেরিয়ে আসা যায়, প্রত্যেকটি ব্যাপার হাতে মুখে বুঝিয়ে দিয়েছিল সেদিন। তারপর বাকশক্তিলুপ্ত পাণ্ডুর মূর্তি সাহেবকে সিনেমার ডামীর মত গন্তব্য স্থানে নামিয়ে দিয়েছিল আমাদের ইস্কুপড্রাইভার।

নতুন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কথা উঠতেই অক্রুর এক দিন আলগোছে বলল, 'অকে আর চালাই না, ছ্যার। আপনাগো সামনে লজ্জা পায় বুঝলেননি?'

কারো উদ্দেশ্যে উনি-তিনি করলেন-খেলেন ব্যবহার নেই অক্রুরের কথা ভাষায়, শুধু অন্তরঙ্গ অবস্থায় খাস দিশী ব্যাকরণ ফলো করে মাঝে মধ্যে।

জিজ্ঞাসু চক্ষুও কপালে তুলে ডেপুটি তাকালেন অক্রুরের দিকে। অক্রুর মুখে যথেষ্ট পরিমাণ গাম্ভীর্যের ম্যাপ এঁকে জানালো যে, বর্তমান ডি. এম ছাত্রাবস্থায় অক্রুরদের বাড়িতে থাকতেন। অক্রুরের মামার তিনি ছাত্র ছিলেন, বয়সেও অক্রুরের থেকে ছোট। তাই অক্রুরদাকে আপনি আজ্ঞে বলে কথা বলতেন। জুনিয়র অফিসারদের সামনে সে ভারি লজ্জার ব্যাপার হবে ভেবে—।

কথা দ্রুত অফিসার মহলে সার্কুলেট হল। ফলে এই দ্বিতীয় কারণে, অনেকেই অক্রুরের অনেক ঝামেলা সইতে লাগলেন। সি সি আর নিয়ে কনস্ট্যাণ্ট দুশ্চিন্তায় ভোগেন তাঁরাই তো সরকারী কর্মচারী। কি জানি ব্যাটা কখন আবার ডি. এম-এর কানে কি লাগিয়ে বসবে ফলে কনফিডেন্সিয়্যাল রিপোর্টে কেচ্ছা হয়ে যাবে।

কিন্তু একটা জিনিস ঠিক, অক্রুব ড্রাইভারের গুণও আছে। সামনে আপনাকে তেমন গ্রাহ্য করুক আব না করুক আড়ালে আপনাকে কড়া সাহেব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। বেশী না, গুটি আষ্টেক 'টুর' করুন অক্রুরের সঙ্গে, দেখতে পাবেন পথেঘাটে আপনাকে সেলাম জানানোব বহর বেড়ে গেছে রীতিমত। আপনি যে মেজাজী সাহেব এ কথা সদর-মফঃস্বলে একাকার হয়ে গেছে। আপনাব স্ত্রী হয়ত খুঁত খুঁত করবেন, এত ঘন ঘন বাইরে যাওয়া, হাওয়ায় নানা রকম কথা ভেসে আসছে। আপনি হেসেছেন কৌতুকের হাসি। টা-টা বলে বিদায় নিয়েছেন আবার, মানে টি-এ টি-এ। আর আপনার এই টি-এ অভিসার সফল করতে অক্রুর যেমন ডাকাবুকো বেরিয়ে আসবে এমন আর কেউ নয়। সত্যি বলতে কি অনেক ড্রাইভাবই নাইট হল্ট কবতে চায় না নানা রকম ছলছুতো করে এড়িয়ে যেতে চায়।

মুফৎগঞ্জের বনবাংলোয় সেদিন নাইট হল্ট করতে এসেছিলেন যে ঘোষ সাহেব, সিনিয়াব ডি. সি। এ অঞ্চলের মধ্যে এই একটিই বন-বাংলো যা তার মনে ধরে। এমন মনোরম পরিবেশ এমন জংগল আর কোথাও নেই। এইটিব প্রথম সন্ধান দেয় অক্রুব, তার কথা স্বভাবতই আজ মনে পড়ছিল এবারই প্রথম অক্রুর আসতে পাবে তাঁর সঙ্গে।

বারান্দার ডেক চেয়াবে শুয়ে শুয়ে চাঁদ ওঠার অপেক্ষা করছিলেন ঘোষ সাহেব। এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই তাই আঁধারের সত্যিকারের রূপ দেখতে পাওয়া যায়। দূরে কোথাও মাদল বাজছে। নিজের সঙ্গে মনে মনে আলাপ করছিলেন ঘোষসাহেব এমন সময় অন্ধকারে

লোকটা এসে দাঁড়ালো, 'অক্রুরবাবু আসেননি তাই আমি আজ নিয়ে এলাম স্যার, ভেতরে রাখি ?'

বিরক্ত হয়ে ঘাড় নাড়লেন ঘোষ সাহেব। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারগুলো এত স্থূল যে তাল কেটে যায় সময় সময়। কিছুক্ষণ ঘুমছুট মানুষের মত বসে থেকে উঠে ঘরে গেলেন ঘোষসাহেব। গিয়েই চমকে উঠলেন। টেবিলের উপরে লণ্ঠনের আলোয় একটি বোতল তাঁকে যেন ব্যঙ্গ করে উঠলো। কাছে গিয়ে নিরীক্ষণ করে বুঝলেন, নিছক ডিস্টিল্ড ওয়াটার নয়, যা ভেবেছিলেন তাই।

ক্ষিপ্ত ঘোষসাহেব লোকটির স্পর্ধায় কিছুক্ষণ ভাষা খুঁজে পেলেন না। বারান্দায় বেরিয়ে হুঙ্কার ছাড়লেন ড্রাইভার !

নতুন ড্রাইভার স্যালুট করে এসে দাঁড়ালো।

রেগে গেলে তোতলাতে থাকেন ঘোষসাহেব। অনেক কষ্টে তাই নিজেকে সংযত করে বললেন, 'সে আছে না চলে গেছে, যে এসেছিল।

ভীত গলায় ড্রাইভার জানালো, সে সাহেবের হুকুমের অপেক্ষায় বসে আছে। ঘোষসাহেব হৈ-চৈ করে ব্যাপারটা ছড়াতে চান না। চাবকাতে হলে লোকটিকেই চাবকাবেন।

'ওকে ঘরে পাঠিয়ে দাও।' দরজা ভেজিয়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে বসলেন ঘোষসাহেব। মাথায় তাঁর তখন আগুন জ্বলছে। লোকটি আসতে যত বিলম্ব করছে তাঁর ক্রোধ ততই বাড়ছে।

হঠাৎ দরজায় শব্দ হতেই তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলেন তাতে ঘোষ-সাহেবের গায়ে কাঁটা দিতে বিলম্ব হল না ; অর্ধাবগুণ্ঠিতা একটি মূর্তি অসঙ্কোচে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে।

সিদ্ধহস্তা

অফিসে এক কামরায় এক চেয়ারে বসে এবং বাড়িতে একই খাটে শুয়ে, এক জায়গায় মুখ দেখে যাদের জীবন কেটে গেল ; সারা জীবন যাদের একটিই রুটিন বাঁধা লাইনে, টাইম-টেবল কোনোদিন বদলালো না তাদের জন্য মমতা অনুভব করেন ঘোষসাহেব। একই জায়গায় শিকড় গেড়ে বসে থাকা গাছের সঙ্গে তাদের তফাৎ কোথায় !

সরকারী চাকুরেদের বরং মস্ত একটা লাভ আছে। তাঁরা কুয়োর ব্যাঙ্ নন, স্রোতের জলে নোনাজলে নোঙর ফেলতে হয় তাঁদের। বদলির চাকরিতে সারাটা জীবনই একটা অবিচ্ছিন্ন টুরের মত, ডাকবাংলোয় রাত কাটাচ্ছেন যেন। আজ আছেন হাঁকডাক করছেন, কালই হয়ত ভিজিটার্স বুকের পাতায় একটা নিষ্প্রাণ স্বাক্ষর হয়ে যাবেন। তাই কোথাও মায়া জন্মায় না, মোহ জন্মে না। একটা মুসাফিরী মেজাজ গড়ে ওঠে।

এ পাড়ায় বাড়ি করে উঠে আসা রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ঘোষ-সাহেব বলছিলেন কথাগুলো। ঘোষ-সাহেব নিজেও মুসাফির ছিলেন একদিন, ঘুরে বেড়িয়েছেন মফঃস্বল বাংলার নানা গাঁয়ে। এখন তিনি আর মুসাফির নন, মোক্ষম মজলিশী মানুষ। ঘরে ঘরে প্রায় ছড়াও হয়েই আড্ডা জমান, প্রতিবেশীদের খবরা খবর নেন। কেউ ডাকলো কি ডাকলো না সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সহাস্যে এবং সস্ত্রীক তিনি উপস্থিত আছেন।

এ পাড়ায় সকলেই প্রায় ঘরকুনো মানুষ, অফিস আর বাড়ির
াঝখানের ডেইলি প্যাসেঞ্জার। বাগান করা আর মাছ ধরা, তাস খেলা
ার গল্প-গুজব অবসরের সর্বস্ব। সেখানে প্রায় সিন্দবাদ নাবিকের
তই রূপ-কথার ঝুলি নিয়ে ঘোষসাহেব এসে গিয়েছেন। কত ঘটনা
ত কাহিনী তাঁর ঝুলিতে, সে সব শুনে রীতিমত নাটক রীতিমত নভেল
নে হয়। লোকে আড়ালে বলে ঘোষসাহেব তাঁর এই রিটায়ার্ড
াইফে দুটি জিনিসের ওপরে ভর দিয়ে চলে থাকেন। প্রথম বস্তুটি
ফয়ারওয়েলে পাওয়া তাঁর সৌখিন ছড়িটি এবং দ্বিতীয় বস্তু বিবাহসূত্রে
াব্ধ দ্বিতীয়পক্ষের ধারালো স্ত্রী।

অর্থাৎ একটিতে দেহের ভর অন্যটিতে বুদ্ধির। বেশ ছিমছাম
ঝাকলা পরিবার ঘোষসাহেবের, তিনি এবং তাঁর স্ত্রী। মেয়েটির বিয়ে
য়ে গিয়েছে, ছেলেটি বিলেতে পড়তে গিয়েছে। সরল বিয়োগ অঙ্ক,
ার থেকে দুই গেলে, দুই। তৃতীয় আর একটি অ্যাবস্ট্রাক্ট অবলম্বন
াছে ঘোষ সাহেবের, সেটি তাঁর গল্প বলা। পাকা ম্যাজিসিয়ানের
ত গল্প বলেন তিনি। চেহারার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব আছে।
বয়টির রং-সাইডে বয়স রান করছে এখন। ফিকে মেহেদী এবং ঘন
াদায় মেশা টেকনিকালার চুল কানের বেশ ওপর পর্যন্ত রগ্‌রগে করে
প-ছাঁটা। মোটা লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা তাঁর ধারালো নাসাগ্রে
াকটা চতুর গাম্ভীর্য এনে দিয়েছে। ঘোষজায়া প্রায় অর্ধেক বয়সী,
াব্যি সেজেগুজে থাকেন, স্লিভলেস হাতায় এবং লিপস্টিকে, প্রজাপতির
ত চঞ্চল একজোড়া চোখে তাঁকে বিলকুল ঘোষ-সাহেবের মেয়ে মনে
য়। প্রথম কিছুদিন এপাড়ায় সকলকে বেশ মাতিয়ে রেখেছিলেন
াষদম্পতি। সকলেরই মুখে মুখে ওদের প্রশংসা শুনতাম। এবাড়িতে
বাড়িতে প্রতিদিন চায়ের নেমন্তন্ন তখন ওঁদের লেগেই থাকতো।
াড়ায় থেকেও আমি রীতিমত অসামাজিক মানুষ, ভালো মিশুকে নই,
াতিবেশীকে নমস্কারের দূরত্বেই বরাবর রেখে এসেছি। তাই
াষমশাইয়ের সঙ্গে আমার আঁতাত জমেনি। কিন্তু গত সপ্তাহে উনিই
ামার নেমন্তন্ন করে বসলেন পথে মুখোমুখী হওয়ামাত্র। অন্য সময়

হলে কৌশলে এড়িয়ে যেতাম হয়ত। কিন্তু ইদানীং কানাঘুষো শুনতে পাই, ঘোষদম্পতির বাজার মন্দা যাচ্ছে। কি কারণে জানি না সবাই তাঁদের প্রায় বর্জন করেছেন। আনা-যানা প্রায় বন্ধ। প্রায় এক ঘরে হওয়ার মত অবস্থা। তবু জোর করে ঘোষসাহেব অনেক সময় সামাজিকতা করতে যান, কাউকে কাউকে বাড়িতেও আসতে বলেন. উপেক্ষা অসম্মান গায়ে মাখেন না। সুতরাং এক্ষেত্রে আমি যদি না যেতাম হয়ত মনে মনে আঘাত পেতেন ওঁরা। তাই গিয়েছিলাম। গিয়ে আনন্দিতই হয়েছি। বেশ সজ্জন ব্যক্তি। সুন্দর সাজানো বাড়ি দামী পর্দা এবং অন্তরঙ্গ আলাপচারি। ঘণ্টাখানেক বেশ জমে গিয়েছিলাম ওঁদের ওখানে। আসার সময় পাল্টা নিমন্ত্রণ রেখে এসেছিলাম।

কাল বিকালে আমাদের বাড়িতে তাই জনা তুই বন্ধুকেও ডেকেছিলাম। গল্প জমে উঠেছিল রীতিমত। তুজন প্রৌঢ় ব্যক্তি মানেই গল্প, জনাচারেক জড়ো হওয়া মানেই আরব্য উপন্যাসের ফাইল খোলা। তার ওপরে ঘোষসাহেবের মত লোক, যিনি একাই একশো।

কালিদাস ভবভূতি হল কিছুক্ষণ। নদনদী নিয়েও আলোচনা হয়ে গেল একপশলা। পৌরাণিক নদনদী, লুপ্ত স্মৃতি কত কিছু। তারপর সরকারী চাকুরির গল্প। সেই প্রসঙ্গে সরকারী চাকুরে বঙ্কিমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র-দীনবন্ধু থেকে ডি এল রায় পর্যন্ত। তাঁদের জীবনের অনেক অলিখিত কাহিনী ঘোষসাহেবের পাঠ্যপুস্তকের মত মুখস্থ। ডি এল রায় নাকি গয়ার ডাকবাংলোয় বসে এক রাত্রে ধনধান্যে পুষ্পে ভরা গানটি লিখেছিলেন। চমৎকার মানুষ ছিলেন উনি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে প্রতিবেশীদের বাড়িতে নাকি গল্প করতে চলে যেতেন। কিন্তু কনাফডেন্সিয়াল ফাইলে শেষদিকের সি সি আর কি কারণে যেন ভালো ছিল না। হ্যাঁ সে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আগাগোড়া সাহেবদের উচ্ছ্বসিত সি সি আর পেয়েছেন। ঘোষ-সাহেব ঈষৎ চোখের ইশারা করে বললেন, বুঝলে না, করিৎকর্মা লোক, কলকাতার কাছ ঘেঁষেই ডেপুটি জীবন প্রায় কাটিয়ে দিলেন।

উত্তর-পুব বাংলায় কেউ পেরেছিল কি বদলি করতে ?

খাবার টেবিলে বসে এই গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ সনাতনবাবু টবিলের তলায় আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। ব্যাপাবটা কিছু ুঝলাম না। অবাক হয়ে কারণ অনুসন্ধান করছি এমন সময় হঠাৎ এক দৃশ্য চোখে পড়লো। 'মিসেস ঘোষ প্রায় সকলের অলক্ষ্যে টবলের ওপর থেকে কি যেন তুলে নিজের জামার মধ্যে চালান করে দিলেন। ব্যাপারটা এমনি অবিশ্বাস্য যে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নাতনবাবু গল্পের ফাঁকে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, দেখলেন ?'

কিছু বললাম না। আমার স্ত্রী একটু পরেই কি একটা ছুতোয় পাশেব ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার ? ফুঁসে উঠলেন মামাব স্ত্রী। 'এই সব চোর জোচ্চোবকে ঘরে ডেকে এনে আদর করে াওয়াও।'

বললাম, 'আঃ আস্তে বলো। কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে ? তোমার কলম আর আমার লিপস্টিক সেট ধাও হয়েছে। টেবলের ওপর যে রূপোর অ্যাশট্রেটা ছিল সেটিও ্যানিশ।"

'তুমি কার কথা বলছো ?'

'.তামার ওই ঘোষ গিন্নী। পাড়ায় তো সুনামেব অন্ত নেই— থনই আমার বোঝা উচিত ছিল।'

'তা হাতে হাতে যখন ধরতে পাবো নি এখন কি করতে পারি লো ?'

'বাঃ তাই বলে ওই দামী কলম আর নতুন লিপস্টিক সেটটা চ্চা যাবে নাকি। চেয়ে নাও, না হলে কিন্তু আমি হুলুস্থুলু বাধাবো। ামায় চেনেনি ওরা'—

নিজের স্ত্রীকে কে না ভয় পায় ? কে না চেনে ? আমি মরীয়া য় অনেক ইতস্তত কবে শেষ পর্যন্ত বিদায় দেবার পর পুনশ্চ ভঙ্গিতে াষসাহেবকে ডেকে গোপনে বললাম কথাটা, তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে

যদি দয়া করে জিনিসগুলো—

চমকে উঠলেন ঘোষসাহেব, 'অ্যাঁ নিয়েছে নাকি। নিজে দেখেছেন ?'

ঘাড় নাড়লাম। উনি কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বললেন 'আপনাকে তাহলে খুলেই বলি আমার স্ত্রীর ক্লিপ্টোম্যানিয়া আছে ?' যেমনভাবে থ্রম্বসিসের কথা লোকে বলে তেমনি যেন প্রচ্ছন্ন গর্বের সঙ্গেই কথাটি বলে স্ত্রীর পিছু নিলেন ঘোষসাহেব।

আমি নিরুপায় হয়ে বললাম 'মিঃ ঘোষ আমার জিনিসগুলো', যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে ঘোষসাহেব বললেন, 'রুগীকে ঘাঁটানো কি ঠিক হবে ?'

তদন্ত

রাক্ষুসে ছাগলের মত আমরা তখন সেই হাফ্‌প্যান্ট পরা বয়সেই নানা সিরিজের প্রায় হাজার দেড়েক খাদ্য অখাদ্য গল্পের বইয়ের অন্ততঃপক্ষে দেড় লক্ষ তেজস্ক্রিয় পাতা চিবিয়ে খেয়ে ফেলেছি। ফলে আমাদের পেটের মধ্যে মিনিমাম শ'খানেক শখের গোয়েন্দা বহাল তবিয়তে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। হোল্ড-অলের মত আমরা তখন হাজার হাজার রোমহর্ষক কাহিনীর প্রাইভেট কেরিয়ার; আমাদের স্মৃতি-স্নায়ু মজ্জা-রক্ত বিলকুল তখন রহস্য-রোমাঞ্চে মজে আছে। আমরাও মজেছি, আমাদের মগজও। কলকাতা শহরটা তখন আমাদের কাছে দুঃস্বপ্নের রূপকথা তার অন্ধকার অলিগলিতে, আলোকিত রাজপথে, অট্টালিকায় কিংবা এঁদো ঘরে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো রয়েছে, সেখানে হত্যা আর রাহাজানি প্রতিদিনের ঘটনা, উন্মাদ বৈজ্ঞানিক আর রক্তলোভী পিশাচের জাগরণে প্রতিটি রাত্রি ভয়ঙ্কর।

মা দিদি পিসিমাদের কথা বাদই দিলাম, কিন্তু দাদা কাকা বাবা সবাই কি ভীষণ বোকা ভেবে খুব কষ্ট হত। নিরীহ সরল

মানুষ তারা। পান চিবুতে চিবুতে অফিস যান, সিগারেট-চুরুট টানতে টানতে বাড়ি ফেরেন, নাকে নস্যি ঠেসে তাস খেলতে বসেন। তাঁদের কোনো দিকেই হুঁস থাকেনা। পানের দোকানে আয়নায় দাঁড়িয়ে তাঁরা একবারও খেয়াল করেন না কেউ তাঁদের 'ফলো' করছে কিনা। অফিস থেকে ফিরে একবারও পকেটে হাত দিয়ে খুঁজে দেখেন না কেউ কোনো উড়ো চিঠি পকেটে গুঁজে দিয়ে গেছে কিনা। ধোপা-বাড়ি কাপড় জামা পাঠাবার সময় মা প্রতি রবিবার বকাবকি করেন, রাজ্যের কাগজ আর টাকাকড়ি পকেটে জমে থাকে বলে।

তাই তাঁরা না জানলেও, আমরা ভালো করেই জানি, যে কাবুলী অলাটি এই মাত্র হিং হেঁকে গেল, সে আসলে ছদ্মবেশী অন্য কেউ। যে কালো মোটর গাড়িটি ঝমঝম বৃষ্টির সন্ধ্যায় ও গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিল তার মধ্যে হয়ত একটি আস্ত মৃতদেহই পাচার হয়ে গেল নির্ঘাত। আমরা ইতিমধ্যে সন্দেহজনক মানুষের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে শিখেছি। নিরিবিলি সেদিনের বাগবাজারের একটি চায়ের দোকানে গিয়ে আমরা এক প্লেট করে আলুর দম নিয়ে ব'সে থাকতাম যদি কোনো ষড়যন্ত্রের সূত্রটুত্র পেয়ে যাই স্রেপ এই ভরসায়। আমি, ফেলু, অনিল, কানু আর অবিনাশ এই পাঁচজন। আমরা আমাদের দলের নাম রেখেছিলাম বাংলার পাঁচ। অর্থাৎ বাংলা দেশের আগামী দিনের পাঁচজন স্বনামধন্য (যখন বড় হবো ততদিনে আমাদের যথেষ্ট নাম ডাক হবে আমরা জানতাম) রহস্যভেদী। ইতিমধ্যেই আমরা তিনটি গুপ্ত ভাষায় চিঠি লিখতে শিখেছি, যে ভাষার পাঠোদ্ধার এই বাংলার পাঁচের সদস্য ছাড়া পৃথিবীতে আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

এ হেন সময়ে আমাদের বিল্টুদার সঙ্গে পরিচয়। আমাদের পাড়ায় তাঁরা নতুন ভাড়াটে এসেছেন। কানু গোপনে সংবাদ আনলো বিল্টুদার দু আলমারী বোঝাই বই আছে যা আমরা তখনো পড়িনি। ফলে আমরা পাঁচজন একদিন পায়ে পায়ে বিল্টুদা সন্দর্শনে গেলাম। বিল্টুদা তখন টেবলের ওপরে কালো পিস্তলটি রেখে একটি আয়নার

সামনে ছদ্মবেশ ধারণ করছিলেন। চোখের পলকে আমাদের দিকে রিভলভার তুলে ধরে হাঁকালেন, 'কে তোমরা, কি চাও?,

আমরাও অশিক্ষিত নই, সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর, হাত তুলে দাঁড়িয়ে আমাদের অভিপ্রায় জানালাম। বিল্টুদা আমাদের লুফে নিলেন। বিভলভার দেরাজে লুকিয়ে রেখে আমাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিলেন। কিন্তু ততক্ষণ যা হবার হয়ে গেছে। আমরা মন্ত্র-মুগ্ধ। ঘুণাক্ষরে প্রকাশ না করলেও আমরা টের পেয়ে গেছি বিল্টুদা কোনো শখের গোয়েন্দা। হয়ত কোনো অভিযানে-বেরোচ্ছিলেন, নইলে গালে অমন চাপ দাড়ি আটছিলেন কেন। তখনকার মত তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট না করে গল্পের বই নিয়েই আমরা ফিরে চলে এলাম। আমি মনে মনে ভাবলাম, দল বেঁধে গেলে বিল্টুদা কিছুতেই নিজেকে খুলবেন না, তার চেয়ে বরং একাএকা একদিন যাবো। কানুটানুদের লুকিয়ে যেতে হবে।

গেলাম। বিল্টুদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতাও হয়ে গেল। রিভলভারটি অবশ্য কিছুতেই বার করলেন না কিন্তু আমাকে তিনি তাঁর দলে নিয়ে নিলেন। মোটা একটা খাতায় আমার নাম উঠলো। ক্রমিক সংখ্যা পেলাম। ক্রমিক সংখ্যা দেখেই বুঝলাম তাঁর দলে অনেক লোক আছে। বিল্টুদাও অস্বীকার করলেন না। বললেন, ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকই এই রহস্যভেদী সঙ্ঘের সভ্য। কিন্তু মজা এই কেউ কাউকে চেনে না, মুখও দেখেনি কখনো। শুধু বিল্টুদার হুকুম তামিল করে যায়। আমিও যদি পরীক্ষায় পাশ করি, বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠি বিল্টুদার হুকুম পালন করার সুযোগ আমিও পাবো। কিন্তু যদি বিশ্বাসঘাতকতা করি, তাহলে, বিল্টুদা ইঙ্গিতে বোঝালেন, গুড়ুম!

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম কাউকে বলব না। বলিও নি। বাংলার পাঁচের কেউ পর্যন্ত আমার মুখ থেকে কিছু শুনতে পায়নি। কারণ তাহলে রক্ষা নেই। বিল্টুদা সব খবর পান। ওঁর স্পাই আছে। আমি সকালে কোথায় গিয়েছি কি করেছি সব বলে দেন বিকেল

বেলায়। তাজ্জব ব্যাপার! ভয়ে গা ছমছম করে। কিন্তু আমাকে স্নেহের চক্ষেই দেখেছেন বিল্টুদা। ছোটখাটো দায়িত্বও দিয়েছেন, অবশ্য তার আগে দুচারটি পরীক্ষায় আমাকে উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। আমি কানু, ফেলু, অবিনাশের গতিবিধির খবর এনেছি হাসতে হাসতে। এ তো আমার কাছে কিছুই নয়।

আমি ইতিমধ্যেই আমাদের পাড়ার লাল রঙের বাড়ির তলায় রোজ সন্ধ্যায় পায়চারি করে বেড়ানো লোকটির পকেটে বিল্টুদার দেওয়া খামটি চোখের পলকে গুঁজে দিয়ে এসেছি। পরদিন থেকে লোকটিকে আর দেখতে পাইনি। সনাতন হাজরা মশাইয়ের টেবিলে, খবরেব কাগজের অক্ষর কেটে আঠা দিয়ে বসানো: 'সব ফাঁস হয়ে গেছে' চিল মুড়ে ছুঁড়ে দিয়েছি, পরদিন থেকে সনাতন বাবুর দরজায় তালা পড়েছে। এতে চমৎকৃত না হয়ে থাকতে পারা যায়!

মনের আনন্দে তাঁর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছি। লাল বাড়ির একতলায় সবিতাদি থাকেন, কলেজে পড়েন। দেখে কেউ বুঝতেও পারবে না এই গুপ্ত সমিতির তিনিও সদস্যা। অবশ্য এসব সিক্রেট ব্যাপার বিল্টুদা বলেননি, আমিই অনুমান করেছি। কারণ মাঝে মাঝেই খামে আঁটা নির্দেশ আমি গোপনে পৌঁছে দিয়ে আসি কিনা।

হঠাৎ একদিন পাড়ায় হৈচৈ কাণ্ড। বিল্টুদা বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। কি ব্যাপার কোনো বিপদে পড়েছেন কিনা কে জানে! ছুটলাম সবিতাদির কাছে। অবাক কাণ্ড, সবিতাদিরও পাত্তা নেই। মন খারাপ করে ফিরে এলাম।

শখের থিয়েটার করতেন বিল্টুদা, সেকথা পরে জেনেছি। কিন্তু আমার শপথ আমি রক্ষা করেছি, কোনো তথ্যই ফাঁস করিনি কাউকে। অবশ্য এই লেখাটির আগে পর্যন্তই।।

স্ত্রী

বিশেষ রূপে বহনের নাম বিবাহ

আমাদের ক্লাব ধীরে ধীরে জন-বিরল হয়ে এল। সন্ত্রাসবাদীর মত যারা হুহুঙ্কারের সঙ্গে তাস পিটেছে একদিন, দাবার ছকের সামনে সমাধিস্থ হয়ে যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছে, তিড়িংবিড়িং লাফিয়ে যারা টেবিল টেনিস খেলেছে, সেইসব অপরাজিত তরুণের দল কোথায় মিলিয়ে গেল একে একে। আমাদের ব্যাচিলর ক্লাব ধীরে ধীরে জনবিরল হয়ে গেল। বিবাহের পর একে একে সরে পড়ল সবাই, এক হনিমুনেই কেউ গত হল, কেউ সিজন ফ্লাওয়ারের মত দুতিন মাস কষ্টে চেষ্টে থেকে গেল। তারপরেই সব ঘোর সংসারী। ঘরে ছেলে কোলে করে এবং বাইরে বেবিফুড বগলে করে তারা দ্রুত অন্তর্ধান হল। অমল তো ফুলশয্যার পরের দিন থেকেই প্ল্যানচেটের সংজ্ঞাহীন মিডিয়ামের মত অন্যের গলায় কথা বলতে এবং অন্যের হুকুম তামিল করতে শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ মালতীর, মানে ওর স্ত্রীর, স্পিরিট ওর ওপরে পুরোপুরি ভর করেছে ইতিমধ্যেই। অমল এমনি স্ত্রৈণ হয়ে গিয়েছে।

অবিশ্যি আপনি বলবেন পৃথিবীতে কে না স্ত্রৈণ? যে প্রৌঢ়ের দল অষ্টপ্রহর নানা কাজে নানা অছিলায় পথে পথে ঘুরে বেড়ান, পার্কের বেঞ্চে গিয়ে বসে থাকেন, নিষ্পরোয়া তাস পেটেন, তাঁরাও ভেতরে ভেতরে নিদারুণ স্ত্রৈণ খোঁজ নিয়ে দেখুন গিয়ে। দুর্দান্ত পুলিশ অফিসার থেকে অন্যমনস্ক অধ্যাপক, দুঁদে উকিল থেকে লস্কার গুঁড়োর মত এম এল এ সবাই স্ত্রী-কাতর, স্ত্রীর সম্যক প্রহরণধারিণী মূর্তির সামনে ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ, নতজানু-রকম একটি বস্তুতে পরিণত হয়ে থাকেন।

আমাদের ভাঙা ক্লাবের শেষ স্মৃতিস্তম্ভ শঙ্করাচার্যকে দেখলে আপনি অবশ্যই একথা বলতেন না। শঙ্করাচার্য আমাদের গৌরব, অপরাজিত পৌরুষের প্রতীক। আজ দশ বছর সে বিবাহ করেছে, কিন্তু একটি দিনের জন্যেও অফিস কামাই হয়ত করেছে কিন্তু ক্লাবে গরহাজির হয়নি। শীতে গ্রীষ্মে বর্ষায় বসন্তে সে অটুট রোডওর ঘড়ির মতই কাঁটায় কাঁটায় নির্ভুল। স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটকের মতই স্বচ্ছন্দ, আমরা যারা বিবাহোত্তর প্যাঁচে পড়েছি তারা সবাই মাঝে মাঝে শঙ্করাচার্যের শরণ নিয়ে থাকি। সে আমাদের মুশকিল-আসান, দাম্পত্য কলহের দাওয়াই বাতলে দিয়ে থাকে। নবীন প্রবীণ সকলকে। শঙ্করাচার্য অর্থাৎ শঙ্কর আচার্য স্বল্প কথার মানুষ, স্বভাবে নিরতিশয় গোঁয়ার, কিন্তু বাইরে খুব ঠাণ্ডা। সাদির পয়লা রাতে সে বেড়াল মারার পক্ষপাতী, সেই তার গুরুমুখী বিদ্যা। সবাইকে ডেকে ডেকে সে সেই কথাই বলে থাকে, সেই পরামর্শই দেয়।

সেই শঙ্কর আচার্যি সম্বন্ধে একটি খবর শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিমল এসে বলল, 'ওরে সবাই আসলে ডুবে ডুবে জল খায়!'

প্রসঙ্গ ধরতে না পেরে বললাম, 'তার মানে?'

'মানে অতি সরল। তোর বেপরোয়া আচার্যিও গোপনে গোপনে স্ত্রীর ফাইফরমাস খাটছে। কাল চীনেবাজারে গিয়ে দেখি—'

চীনেবাজারের গল্প এই রকম। আচার্যি প্রায়ই ইদানীং অফিস ছুটির পর, সহকর্মীদের চোখ এড়িয়ে চীনে বাজারে গিয়ে স্রেফ মেয়েদের মত হরেক দোকানে ঘুরে ফিরে টুটাফাটা জিনিস শস্তায় কিনে

আনে, সেগুলো ভালো করে কাগজের মোড়কে ঢেকে বাড়ি নিয়ে যায়। কথাটা অনেকদিন থেকেই বিমলের কানে এসেছিল, কিন্তু কাল শনিবার বিকেলে একেবারে বামাল শুদ্ধু ধরে ফেলেছে আচার্যিকে। চায়ের কাপ ডিস কিনছিল আচার্যি। বিমলকে দেখে গোপন করে দেবার চেষ্টাও করেছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পালাতে পারে নি।

শঙ্কর আচার্যের স্ত্রী অনুরাধা আচার্যের সৌখিনতার খ্যাতি ছিল স্ত্রীমহলে। ড্রইং রুম সাজাতে, নিত্য নতুন টি-সেট, সরবত সেটে পানীয় পরিবেশন করতে তার জুড়ি ছিল না। সুতরাং চানেবাজারের সওদা গিরি যে আচার্যির স্বাধীন বাণিজ্য নয়, একথা চোখ বুজেই বোঝা যায়। কথাটা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। রবিবারের সকালে খবরের কাগজে প্রথমেই রাশিফল পড়ে ফেলে কোনো কোনো হপ্তায় মন ভেতো হয়ে যায় যেমন।

ভালো লাগছিল না। ভাবলাম একবার শঙ্করের বাড়িতে গিয়ে গোলমীপনার নমুনা স্বচক্ষে দেখে আসি। ক্লাবে এসে যাতে বড় বড় কথা বলতে কোনোদিন আর সুযোগ না পায়।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সবে ওদের দোতলার বারান্দায় পদার্পণ করেছি অমনি ফ্লাইং সসারের মত রহস্যময় একটি চাকতি বোঁ বোঁ শব্দে আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে রেলিংএ ঠেকে চুরমার হয়ে গেল। সেটা কি বস্তু যেই দেখতে গিয়েছি অমনি আমার পায়ের কাছে কামানের গোলার মত একটি কাপ এসে ফাটলো। গৃহ-যুদ্ধ অনেক দেখেছি। কিন্তু গৃহের মধ্যে এমন গেরিলা ফাইট ইতিপূর্বে আর দেখিনি। কে কাকে লক্ষ্য ক'রে এসব ছুঁড়ছে, আমাকে লক্ষ্য ক'রে কিনা বুঝতে না পেরে বিশুদ্ধ বঙ্গ-ভাষায় আর্তনাদ করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে শঙ্করের রুদ্রমূর্তি উঁকি দিল। তার হাতে তখন গোটা দুই সৌখিন চিনেমাটির কাপ। সেকেণ্ড-খানেক আমার দিকে রক্ত চোখে তাকিয়ে থেকে অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ভেতর আয়'।

মনে হল ফ্রীজের ভেতর থেকে কথা বলছে এমন শীতল কণ্ঠস্বর।

ভয়ে ভয়ে ভেতরে গেলাম। শঙ্কর প্রায় কানে কানে বলল, 'একটু দাঁড়া হাত খালি করে নিই আগে, মাত্র দুটো বাকি আছে।'

তারপর কিছু বোঝার আগেই অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে হুঙ্কার ছেড়ে প্রথমে ডান হাতের কাপটি এবং পরে কয়েক মুহূর্তের বিরতি ও নীরবতার পশ্চাৎ বাঁ হাতের কাপটিও বারান্দার ওপর আছড়ে ভাঙলো। আমি স্তম্ভিত। বারান্দায় ইতস্তত যে পরিমাণ ভগ্নবিশেষ জমেছে তাতে মনে পড়ল পুরো একটি সেটের সঙ্গতি সম্ভব সে করে ফেলেছে।

'একি করছো শঙ্কর ছি ছি।' আমি, অভিযোগ করলাম।

হা হা করে হেসে উঠে শঙ্কর যেন কেবল আমার উত্তরই দিল না ঈষৎ দূরবর্তী কাউকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'নীট পঞ্চাশ টাকা দিলাম গুঁড়ো করে, দরকার হলে আরো দেব···সব হা হা হা···'

ভেতর মহলে তখন গোঙানির শব্দ শোনা যাচ্ছে। আমি উঁকি দিয়ে দেখি ভয়ঙ্কর কাণ্ড! শোবার ঘরের মেঝের ওপর অনুরাধা বেঁকে দুমড়ে পড়ে আছে। মুখে দিয়ে গ্যাঁজলা আর গোঙানি বেরোচ্ছে। আমি আতঙ্কিত গলায় বললাম, 'শঙ্কর শঙ্কর···তোমার স্ত্রী অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে যে···ফিটের ব্যারাম ট্যারাম কিছু আছে নাকি দেখ দেখ···'

শঙ্কর তখন গায়ে পাঞ্জাবী গলাতে গলাতে বলল, 'চল একটা মর্নিং শো দেখে আসি।'

'স্ত্রীকে এইভাবে ফেলে রেখে? তোর মত পাষণ্ড—'

অ্যাসট্রের ওপর থেকে জ্বলন্ত সিগারেটটা তুলে নিল শঙ্কর, তারপর অর্ধভুক্ত সিগারেটে মৃদু টান দিতে দিতে মুচকি হেসে বলল, 'একটা মজা দেখবি?'

স্ত্রীর দিকে এগিয়ে গেল শঙ্কর, কি মতলবে যেন স্ত্রীর পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসল, তারপর সিগারেটের আগুনের একটু আলতো ছোঁয়া ব্যস! নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যেন। মুখে গ্যাঁজলা ওঠা অনুরাধা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল, 'আমাকে পুড়িয়ে মারলো গো'—

প্রতিভা

বাইস্কেলের মতই ছিপছিপে একনলা চেহারা, সমস্ত শরীরটা বুঝি ট্রিগার টেপার অপেক্ষায় সজাগ ক্ষিপ্র এবং ঋজু হয়ে আছে, কিন্তু তবু যেন প্রয়োজন হলে ভাঙা যায়, খোলা যায়, ভাঁজ করা যায়। নানাবকম পার্টস-স্প্রীং ইত্যাদি জুড়ে জুড়ে যেন তা তৈরি হয়েছে। ব্যারেলের মধ্যে কয়েক রাউণ্ড স্ক্রুপ ঘোরানো প্যাঁচ রয়েছে, বুলেটরূপী বাক্য বেরোনোর আগে পর্যন্ত বাইরে থেকে ঠাহর হয় না। বেয়োনেটের মত সুতীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল চশমা, মুখে কাচগুঁড়োর মাঞ্জন দেওয়া সপ্রতিভ হাসি। বাটখারার মত ভারি ভারি কয়েক খণ্ড বই সব সময় হাতের পাল্লায় উরুর পাশে ঝুলছে। ছোটোখাটো মোবাইল লাইব্রেরী একটা। বইগুলি সত্যিই ভারি, ওজনে এবং ধারে 'সর্বাধুনিক' বুদ্ধিদীপ্ত বিদেশী বই: রক্তারক্তি সমালোচনা, হাড়ভাঙ্গা তর্কবিতর্ক, আর ঝাঁজালো প্রবন্ধের কেতাব এবং তৎসহ কিছু ককটেল লিটারেচার। এই বলে, গিরীন তালুকদার, বন্ধুজনের

ওরফে গ্রীন। অর্থাৎ গ্রীন ওয়াজ অলওয়েজ বুকড, অ্যাণ্ড হেভিলি বুকড।

কিশোর বয়স থেকেই গ্রীন আমাদের কাছে বিস্ময়। কিশোর বয়স থেকে, তার কারণ তৎপূর্বে তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেনি। ক্লাস নাইনে উঠে তাকে যখন প্রথম পেলাম আমরা, তখনই সে প্রি-ম্যাচিওর প্রতিভা একটি। আমাদের নাগালের অনেক বাইরের মানুষ। প'বপক্ক দ্রুত ধাঁচের হাতের লেখা, ভাষাও বেশ চমকদার, খ্যাতনামা শিল্পী সাহিত্যিক চলচ্চিত্রকর, গুরুতর পণ্ডিত—যাকে বলে ম্যান অব ক্যাপিটল লেটার্স, সকলের সঙ্গেই দুরূহ বিষয়ে দু চার ছত্র পত্র লেখা হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। দেরাজে তাড়াতাড়া চিঠি জমে আছে দেখতাম। দুটো মোদ্দা কথা বুঝে নিয়েছিলাম আমরা: যে কোনো আবহাওয়ার উপযোগী করে ঈশ্বর গ্রীনকে নির্মাণ করেছেন এবং গ্রীন হচ্ছে বর্ন ইণ্টেলেকচুয়াল। শুধু বই জার্নাল আর খবরের কাগজ পড়ে কেউ অমন দাড়ি কামানো ব্লেডের মত চৌকস ধারালো হতে পারে না।

স্কুলে থাকতেই থাকতে গ্রীন জেলে গেল। তার মত ছেলেকে জেলখানাও হজম করতে পারলো না। কয়েক দিনের মধ্যেই খালাস পেল। তারপর হঠাৎ একটি অশ্লীল পত্রিকা বেরোলো, তার যুগ্ম সম্পাদকের একজন গ্রীন, মানে আমাদের গিরীন। আমরা তো ভাবতেই পারি না। অনেক কঠিন অঙ্ক মেলাতে পারি, কিন্তু গিরীনকে মেলাতে পারি না। একটি খারাপ শব্দ যার মুখে কোনোদিন শুনিনি, সেই হল কিনা অশ্লীলতার মাস্টার। অবশ্য ইণ্টেলেকচুয়ালরা সমাজে চিরদিনই নাকি ধাঁধা, ধূমকেতুর মতই তাদের পথ ধোঁয়ার পথ।

এই গিরীন কিন্তু ছাত্রজীবনে আমাদের অনেক ভুগিয়েছে। কলেজে ইউনিভার্সিটিতে আমরা সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতাম, গিরীন কখন কি অঘটন ঘটিয়ে বসে। কারণ গিরীনের পক্ষে সব সম্ভব, তার মত স্মার্ট ছেলের পক্ষে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করা হাস্যকর। তার মাথায় চকিতে যা উদয় হবে তাই সে কাজে পরিণত করবে।

ভয় লজ্জা সঙ্কোচ বলে কিছু নেই। বিশাল গুরুগম্ভীর সভার এক কোণ থেকে প্রথমে নিরীহ ভঙ্গিতে একটি হাত উঠলো হয়ত—এবং তারপর সেই হাতের অধিকারী গিরীন—আমরা সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। কারণ আমরা জানি গিরীন এইবার পেনালটি কিক করতে উঠল। সামলাতে অনেক সময় প্রাণান্ত হবার দশা আমাদের।

একবার বাসে কণ্ডাকটারের সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া বেধেছে গিরীনের। তর্কে গিরীন কোনো দিনই পরাজিত হয় না, বাসশুদ্ধ লোক গিরীনের বিপক্ষে কিন্তু গিরীন অটল। শেষে টার্মিনাসে পৌঁছে নামবার কালে একজন ভদ্রলোকের কান মলে দিয়ে গিরীন ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। আমরা তো থ। বেশ সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক, কাঁধে একটি দামী ক্যামেরা, অপরাধের মধ্যে তিনি মধ্যস্থতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। পরে জেনেছিলাম কাঁধে চামড়ার বেল্ট দেখে তাকেও আর এক-জন কণ্ডাকটার ভেবে গিরীন চটে গিয়ে ওই কাণ্ড করেছিল।

একদিন উত্তর কলকাতার মোড়ে দেখি খুব ভিড়। বিপরীত ফুটপাথে শ্যামানন্দ দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভাবে সিগারেট টানছে। শুধালাম, কি রে ওখানে কিসের গোলমাল?

—কি জানি, কোনো বাজে ছেলে-টেলের ব্যাপার হবে হয়ত।

এগিয়ে ভিড়ের মধ্যে উঁকি দিলাম, দেখি ঠিক গিরীনের কাণ্ড। ব্যাপারটা অবশ্য শ্যামানন্দকে নিয়েই। শ্যামানন্দ মোড়ের স্টলটায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যহ পত্রিকা পড়ে। সাপ্তাহিক মাসিক এমন কি ত্রৈমাসিকের যাবতীয় ধারা-বাহিক রচনা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে। কিছু বাদ দেয় না, প্রিন্টিং মিসটেক পর্যন্ত মুখস্ত। বিনি পয়সায় এতাদৃশ পাঠস্পৃহায় বিরক্ত হ'য়ে বুক স্টলের মালিক সেদিন শ্যামানন্দের হাত থেকে পত্রিকা কেড়ে নিয়েছে। অপমানিত শ্যামানন্দ গিরীনকে দেখতে পেয়ে তার কাছে নালিশ জানিয়ে ওদিকের ফুটপাথে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে একজন পথচারীর নতুন ছাতা চেয়ে নিয়ে স্টলওলাকে

বেদম পিটিয়ে দু'খানা করে ফেলেছে গিরীন। ভয়ঙ্কর কাণ্ড।

এর থেকেও অনেক ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়তে হয়েছে আমাদের। একবার রাত দুটোর সময় উত্থান শক্তি রহিত আহত গিরীনকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছিলাম আমি। মনে দুশ্চিন্তা ছিল, কদিন ওকে শয্যাশায়ী থাকতে হবে এযাত্রা কে জানে! রাত পোহায়নি তখনও। কলিং বেলের আওয়াজে কাঁচা ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে দরজা খুলে দেখি, বেশ দাড়িটাড়ি কামিয়ে পাটভাঙা পাঞ্জাবির ওপর চাদর চাপিয়ে গিরীন হাসিমুখে উপস্থিত।

কোনোদিন বই না পড়ে গিরীন তর্ক করল, বাজী জিতলো পরীক্ষায় পাশ করলো। শুধু ফ্লাই লীফ পড়ে যে কোনো বইয়ের ওপর সে ঝাড়া তিন ঘণ্টা অপরাজিত তর্ক করতে পারে, তাকে আটকাবে কে। অধ্যাপক হল গিরীন, কলেজ থেকে ইউনিভার্সিটিতে গেল এবং সেখান থেকে সোজা আমেরিকায়। পীসকোরের দুটি আমেরিকান যুবকের সঙ্গে সেদিন আলাপ হলো ট্রেনে। তারাও দেখলাম গ্রীন তালুকদারকে চেনে। গিরীন আমেরিকায় গিয়েও ছাত্র মহলে টেরর সৃষ্টি করে ফেলেছে! ডায়াসে উঠেই ছাত্রদের বেয়ানেট চার্জ করতে থাকে—ইয়্যু? ইয়্যু? ইয়্যু অর্থাৎ তুমি? তুমি? তুমি? তুমি?

প্রশ্নের ঠেলায় আমেরিকান ছাত্ররাও কাৎ। তারা গিরীনের নাম দিয়েছে মিঃ বুলেট।

রুচিকর
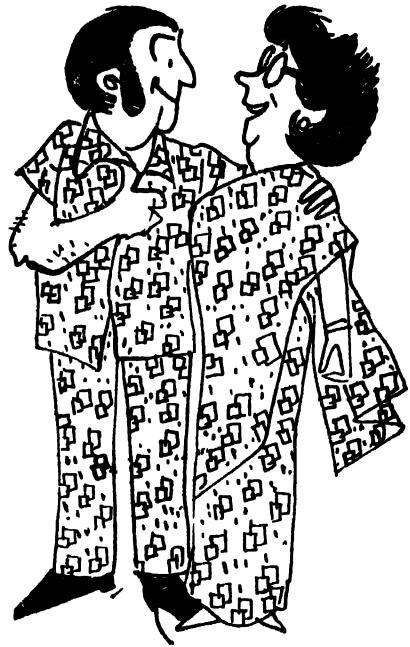
হুগলী মহসীন কলেজের দিক থেকে সবুজ ট্রাউজার্স-হলুদ শার্ট আর লাল টকটকে টাই পরা একটা চাল্লুশ মূর্তিকে মাঠ ক্রশ করে আসতে দেখা যেতেই উনপঞ্চাশ নম্বর ধাপির মেম্বাররা গেরিলা ফাইটারেব মত চোখের পলকে পোজিশন নিয়ে বসল। আওয়াজ তৈরি, কিন্তু রেঞ্জের মধ্যে না এলে ছাড়া যাচ্ছে না। তিনশ পঁয়ষট্টী নম্বর ধাপির মত তারা অবশ্য এনট্রান্স নয়, ফ্রন্ট লাইনে নেই, মাঠমুখী যে কোনো মেয়ে-পুরুষকেই ডাইঅ্যাগনোজ করা কিংবা মন্ত্রের মত কানে কানে পাশ-ওয়ার্ড ইস্যু করে মাঠে অ্যাডমিশন দেওয়া এবং আবার যথাকালে সেইসব লেবেল্ড মালকে আইডেন্টিফাই করে রিলিজ করার দায়িত্ব তাদের নয়। তাঁরা আছে মাঠের মাঝদরিয়ায়, ফিজিক্যাল মধ্যমণির মত; তাছাড়া অধিকাংশ সময়েই ইনটেলক-চুয়াল আলোচনায় ব্যস্ত। কেউ তাদের এম. কম, এম. এস-সি'র ছাত্র, কেউ ল পড়ছে প্রাতঃকালে, কেউ থিসিসে ঝিমুচ্ছে একটানা কয়েক বছর, এরই অবসরে কেউ আবার ফাঁকতালে পোয়েট্রিফোয়েট্রিও লেখে।

স্মরি। ধাপি কি বস্তু, আগেই বোধ হয় তা আপনাদের কাছে খুলে বলা উচিত ছিল। ধাপি হচ্ছে চুঁচড়ো ব্র্যাণ্ড মেঠে কালভার্ট। চুঁচুড়ার বিশাল মাঠের মধ্যে এরকম অনেক কালভার্টরূপী কংক্রিট বেঞ্চ ছড়ানো রয়েছে, প্রতি অপরাহ্ণবেলায় যেখানে জমিয়ে গুছিয়ে অ্যাবস্ট্রাকট্ আড্ডা বসে। শুধু আড্ডাই নয়। এত বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন মেজাজের মানুষ এখানে জমায়েত হয় যে, চুঁচুড়ার কালচারাল সোশ্যাল গ্যাদারিংও বলা যেতে পারে একে। একটা শ্লোকই আছে ধাপিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী বলে। ধাপির এক্স মেম্বার ব্যক্তিরা এই বিপুলা পৃথিবীতে যে যেখানেই ছড়িয়ে থাকুন না কেন, চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়, সামান্য আকারের সেই কংক্রিট আয়ত ক্ষেত্রটির জন্যে এই মুহূর্তে তাঁরা সবাই মনে মনে নষ্টালজিয়ায় ভুগছেন। স্বজাতি প্রেমের মতই ধাপিগোষ্ঠীর মধ্যেও একটা প্রচণ্ড আতের টান আছে, একথা বলাই বাহুল্য।

একটু কাছে আসতেই দেখা গেল ট্রাইকালারের সেই চালু মূর্তিটি তাদেরই ধাপি-সদস্য উল্লাসচন্দ্র। ফাটা ফানুষের মত সবাই একসঙ্গে শব্দ করে উঠল, ধ্যুষ!

ঘন্টু বলল, 'একেবারে ট্রাফিক সিগ্ন্যাল বনে গেছে মাইরি। উল্লাসের হল কি?'

উল্লাস ততক্ষণে এসে পড়েছে। সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে উল্লাস একটা ভারত-নাট্যম দিয়ে দাঁড়ালো। ধাপি-সেক্রেটারী সঙ্গে-সঙ্গে ইলেকশন-ক্যাণ্ডিডেটের মত পাল্টা দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বলল, 'বন্ধুগণ, আসুন আমরা উল্লাসচন্দ্রের বিগত আত্মার উদ্দেশে এক মিনিটকাল নীরবে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করি।'

উল্লাস হেসে ফেলে বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রশ্নটা হচ্ছে রুচির। রুচিহীন মানুষ আর মৃত মানুষ দুই-ই এক। সময়বিশেষে উভয়েই আমাদের করুণার এবং ভয়ের কারণ হয়।'

লোটন শুধলো, 'তুই কি তোর থিসিস সাবমিট করতে এসেছিস নাকি আমাদের কাছে?'

একপাশে জায়গা করে বসে পড়ে উল্লাস জানালো, 'এই আগস্ট থেকেই আমি একটা খুব প্রফিটেবল বিজনেস স্টার্ট করতে যাচ্ছি ব্রাদার'—হঠাৎ ঘন্তুর দিকে চোখ পড়তেই কাঁচির মুদ্রায় দুটি আঙুল বাড়িয়ে দিল তার দিকে। ব্যাজার মুখে ঘন্তু তার গোপন স্টক থেকে একটি সিগারেট বের করে উল্লাসের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁকে পরিয়ে দিল। সেক্রেটারি দেশলাই ঠুকে ফায়ার করলেন। মুখাগ্নির পর ধোঁয়াটে হাসি হেসে উল্লাস বলল, 'তোমরা লাইটলি নিয়েছ কিন্তু ঠাট্টা না। আমি সত্যিই এই আগস্টে বালীগঞ্জে দোকান খুলছি।'

'হঠাৎ?' লোটন হাঁ হয়ে গেল।

ঘন্তু শুধলো 'শেষে অদ্দুরে বালীগঞ্জে? কিন্তু টাকা?'

'মামার নীচে তলার ঘরটা ফ্রি পাচ্ছি কিনা। উইথ টেলিফোন কানেকশন! টাকার প্রশ্ন নেই, শুধু রুচির প্রশ্ন।' নিজের কপালে কুর্নিশের ভঙ্গিতে একটা আঙুল ঠেকিয়ে বলল 'এই ক্যাপিটল। তবে সেই সঙ্গে তোদের হেলপ আমি চাই।'

কে একজন সদস্য গম্ভীর গলায় বলল, কিসের দোকান সেইটেই জানলাম না, হেলপ্!'

'রুচির দোকান।'

ফাটা, ফানুষের মত একটা সনিশ্বাস আওয়াজ বেরোলো সকলের গলা দিয়ে, 'রুচির দোকান!'—

'হ্যাঁ, ন্যায্যমূল্যে রুচির দোকান। বাংলা দেশে শতকরা পঁচাত্তরজন লোকেরই জনডিসড্ আই, প্রায় সবাই রুচির অ্যাকিউট অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। এক কথায় সমস্ত দেশজুড়ে হয় রুচি-বিকার' নয় রুচি-অন্ধ অবস্থা চলেছে। অথচ নিজের পরিবারে নিজের চার-পাশে একটু কৃষ্টি, একটু কালচার একটু রুচি ফোটাতে কে না চায়? কেমন বাড়ি হবে, কি রঙের গাড়ি, কোন্ ঘরে কোন্ ডিজাইনের কি আসবাব থাকবে, দেওয়ালে কার আঁকা কি ছবি কোথায় ফ্রেস্কো দাঁড়াবে, বসবে চাইনীজ ফ্লাওয়ার ভাস্, কোথায় উড়বে কোন্ রঙের নক্শাল পর্দা—এ তো ধনী মানুষের চিরকালের সমস্যা। তোমরা কি বল?'

ঘন্তু আর লোটন ডুয়েট চিৎকার ছাড়লো, 'ইউনিক !'

নস্কর আর কামাখ্যা রিলে রেসের মত বলে চলল, এ একেবারে 'টপ্' আইডিয়া, বাংলা বিজ্ঞাপনের ভাষায় সর্বাধুনিকতম। দোকান চলবে হৈ হৈ করে, আমরা সবাই সেখানে মগজ যোগাবো। একেবারে যাকে বলে রোরিং কারবার। সমস্ত কলকাতা শহরকে ট্যারা করে দেব। কিন্তু একটা লাগসই নাম দিতে হবে, মাইরি! 'জাতীয় রুচি উন্নয়ন বিপণি। বা এই রকম একটা কিছু'—

'ধ্যাৎ, ওই ন্যাকামির মধ্যে আর না।' অন্ধকারে কে একজন পাপি সদস্য বলল 'নাম হবে স্পষ্ট অক্ষরে সরাসরি। রুচির দোকান! সাইন-বোর্ডে লেখা থাকবে : সর্বাবস্থায় টেক্কা দিতে সক্ষম অলপ্রুফ্ হিউমার, ইনটেলেকচ্যুয়াল স্টানট, ড্রইংরুম হিপ্-নোটিজম, কাফ হাউসকীপিং, ব্লাফ ম্যাজিক এবং যাবতীয় আসর-বাসর-মজলিশ কামাল করা রুচি আমরা দ্রুত সরবরাহ করে থাকি।'

'ফুটনোট নেইল পালিশ থেকে টপ্‌সিক্রেট হেয়ার ড্রেসিং, টাই টু ট্রাউজারস-এর লে-মেজ্যাবেবল্, লিপ-স্টিক্ শুটিং, সকল প্রকার কালার ম্যাচিং, পুত্রকন্যা সিরিজের নামকরণ, কি ছবি দেখবেন, কি বই কিনবেন কোন্ কোন্ পত্রিকা রাখবেন, প্রতি-মুহূর্তের ছোট-বড় মেজ-সেজ যাবতীয় রুচির প্রশ্নে একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। সশরীরে আমাদের কাউনটারে আসারও প্রয়োজন নেই, সিম্‌টম জানিয়ে ফাস্‌ট একটা রিং করুন'—

লোটন হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ালো, 'তোমার রুচির দোকানের পাশে আর একখানা ঘর হবে ভাই?'

'কেন কি হবে?' সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো উল্লাস।

'এই ফাস্‌ট একটা খাবারের দোকান দেব, নাম দেব অরুচির দোকান!'

ঘরণী

বন্ধুপত্নী আমাব দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, তাঁর চোখে তখন দুর্লভ খুশির আলো চকচক করছিল। মাথার বমিচূড়া খোঁপা, গ্রীবার ধনুক এবং কাঁধে পৌঁছানোর একটু আগে যেখানে শাড়ির পাড আচমকা মারাত্মক ঢেউ খেয়েছে সেই সব বিন্দুগুলি একসঙ্গে জুড়লে একটা নিখুঁত জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়, চিবুকে চোখে যেন সেই প্রশ্নেরই দ্যোতনা।

বন্ধু নিখিলেশ বোধকরি সদ্য অফিস থেকে ফিরেছে, জামাকাপড় তখনও ছাড়তে পারেনি। কমলার ফরমাসে শেষবারের মত ড্রয়িংরুমের ফার্নিচার টানাটানি করছিল সম্ভবতঃ। কারণ কলিংবেল টেপার আগে ওদের টুকরো কথা এবং আসবাব ঘসটানির শব্দ কানে এসেছিল। জ্যালজেলে স্ক্রীনের সামনে বসে দর্শকরা যেমন স্টেজের ওপর সেট বদলের শব্দ এবং দুর্বোধ্য ছায়াচিত্র দেখতে পায়, পুরু পর্দার

এপারে দাঁড়িয়েও আমি ওদের ব্যস্ত এবং দ্রুত ব্যবস্থাপনার আভাস পেয়েছিলাম।

তারপর পর্দা সরিয়ে আমাকে দেখেই বন্ধুপত্নী কোলাহল করে উঠলেন, 'লেখক মশাইয়ের এতদিনে সময় হল আমাদের কুঁড়েঘরে পায়ের ধুলো দেবার। কি ভাগ্যি!' নিখিলেশ ঘর্মাক্ত কলেবরে বেরিয়ে এল, 'কি রে অ্যাদ্দিনে মনে পড়লো আমাদের?

কমলা বললেন, 'ভেতরে আসুন আপনার বন্ধুর আনাড়ি কীর্তি দেখে যান।'

ভেতরে ঢুকেই তাজ্জব, আমাদের বাঙাল নিখিলেশ করেছে কি! এতদিন পরে একটা মাথা গোঁজার আস্তানা করেছে এই পর্যন্তই জানতাম কিন্তু এমন ছোট হালফ্যাশানের বাড়ি এবং এমন ডেকোরেশন দেখবো আশাই করিনি। ছাত্র বয়সে যার চালচুলো ছিল না, জামাকাপড় ছেঁড়া স্যাণ্ডেলে আর উস্কোখুস্কো চুলে যে মূর্তিমান অমিল অঙ্কের মত দু বেলা ট্যুইশনে দৌড়তো, ফুরসুৎ পাবামাত্র মুহুর্মুহু নাকে নস্যি ঠাসতো সেই কিনা আজ মনোহারী কাণ্ড ঘটিয়ে আমাকে তাক লাগিয়ে দিল! আসলে নিখিলেশকে মানুষ করেছেন কমলা, এ তাঁরই ক্রিয়েশন, রিক্রিয়েশনও বলা যায়।

দেওয়ালের ডিসটেম্পার, সোফা সেটের মডার্ন ডিজাইন, ঘাসের লনের মত পুরু গালচে এবং তার সঙ্গে ম্যাচিং গ্র্যান্টের মত দামী পর্দায় সবর্ণ সাহচর্য, স্টেজের ওপর ক্রস লাইনে প্রজেকশনের মত বিপরীত দেওয়ালের সমুজ্জ্বল অয়েলপেন্টিং, ফ্লাওয়ার ভাস পোসিলিনের টবে রাখা মানিপ্ল্যান্টে ফিনিশিং টাচ, সব মিলিয়ে একটি অশ্রুতি অর্কেষ্ট্রা যেন।

নিখুঁত জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে যেন কমলা নীরবে তাকিয়ে ছিলেন আমার বিস্ময়-স্পৃষ্ট মুখের দিকে। রসিক জনের তারিফ চায় যেমন শিল্পী মনে মনে। আর্ট কলেজে দু বছর যিনি শিল্প চর্চা করেছেন প্রাগ্‌বিবাহ জীবনে, এযেন তারই ফলিত গার্হস্থ্য চিত্র।

বললাম, 'বাঃ বৌঠান একেবারে ক্রিটিকের পিলে চমকে দিয়েছেন

যে, করেছেন কি মশাই ?'

সত্যিই সাজিয়ে গুছিয়ে থাকতে সবাই জানে না। আমি তো লেখাপড়ার টেবিলটাকে জগন্নাথক্ষেত্র বানিয়ে রাখি। সিগারেটের ছাই, মুখপোড়া দেশলাইকাঠি, ছেঁড়া ড্যালা পাকানো কাগজ যদি আমার চার পাশে ছড়াছড়ি না যায় আমি স্বস্তিতে লিখতেই পারি না। আর এখানে কোথাও এক কণা ধূলো নেই, এক বিন্দু ফাঁক নেই যা কমলার সজাগ আঙুলের প্রসাধন থেকে অব্যাহত রয়েছে। সমস্ত ঘরটা আসবাবে সাজানো, ভরাট সচ্ছন্দ সুখী সম্পূর্ণ একটি ঘর, যেন আর এক চুল চাপালে তালভঙ্গ হবে, ছন্দ কেটে যাবে।

কমলা অত্যন্ত তৃপ্ত হাসি হেসে প্রতিটি ফার্নিচারের মূল্য এবং মর্যাদা এবং তাৎপর্য বোঝালেন। সমস্ত ঘরের সেটিং, তার টোটাল এফেক্ট এবং কালার কম্বিনেশন কত মাথা খাটিয়ে বার করেছে সব সবিস্তারে জানালেন। পাশাপাশি কালার ব্লাইণ্ড প্রতিবেশীর গৃহসজ্জা, রুচিহীনতা কিছু বাকি রাখলেন না। নিখিলেশের 'বস' ড্রইং রুম দেখে কি রকম লিটারেলি ট্যারা হয়ে গিয়েছিলেন ক্যারিকেচার করে দেখালেন।

নিখিলেশ কখন আমার পাশে ধপ করে বসে পড়েছিল আমি খেয়ালই করিনি কিন্তু কমলার চোখে অর্থপূর্ণ বিদ্যুৎ খেলে যেতে দেখলাম যেন।

বন্ধুপত্নী মুখে অবশ্য কিছুই বললেন না, তাঁর প্রাক্তন গল্পের ধারাবাহিকতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হলো না কিন্তু স্বামীকে যে বিনি কথায় কিছু বলা হলো তা অনুমান করতে আমার মত মুর্খেরও বিলম্ব হলো না। নিখিলেশ বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়ালো। স্যালুট করলো না, কিন্তু পারফেক্ট স্যালুটের ভঙ্গিতে দাঁড়ালো। বুঝলাম সব ঘরেই দাম্পত্য শাসনের একটি নিঃশব্দ ভাষা আছে।

তারপর চা এল। চাকর ট্রে আনতে গিয়ে সোফা সেটের ন্যাচরাল বার্ণিশ করা হাতলে ধাক্কা লাগালো, বোধকরি এক কৌটো চা-ও তার ওপর পড়লো, গালচের ওপর তো বেশ খানিকটা। কমলার

মুখের রং সঙ্গে সঙ্গে যেন বিবর্ণ হয়ে গেল, আঁচল দিয়ে তৎক্ষণাৎ হাতলটা মুছে ফেললেন কিন্তু একটা আহত বেদনা যেন মুখের ওপর ছায়া ফেলেই রইল। চাকর বকুনি খেল। নিখিলেশ যতদূর সম্ভব হাল্কা ভঙ্গিতে সোফার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসে থাকলো। আমারও কেমন যেন দমবন্ধ লাগছিল। ছোটবেলায় একটি পরিবারকে দেখতাম। খুব ছিমছাম। প্রতিদিন মূল্যবান খাটের ওপর দুধের সরের মত সাদা চাদর পাতা হতো, পাশবালিশ আর বালিশ টাটকা সাজানো হতো। পুতুলের আলমারীতে এক আলমারী পুতুল। দেওয়ালে বনেদী ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলছে। প্রতি দিন রাতে কিন্তু গৃহস্বামী মেঝেতে মাদুর পেতে একটি গামছা পরে ঘুমোতেন। পরে জেনেছিলাম, ওই নিভাঁজ শয্যায় কয়েক জেনারেশন কেউ কখনো ঘুমোয়নি। কত মাদুর এলো, কত মাদুর গেল কিন্তু খাটের বিছানা অটুট।

হঠাৎ মনে হল এই ঘরে নিখিলেশেরও স্থান নেই, তার স্ত্রীরও না। এখানে শুধু হালফ্যাশান আর ফার্নিচারের জায়গা হয়েছে, সেই 'উটের' মত ধীরে ধীরে তারা ভেতরে প্রথম মাথা গলিয়েছিল এক দিন, তারপর সমস্ত দেহের সংস্থান করে নিয়েছে।

উচ্চমধ্যবিত্ত নিখিলেশ এবং কমলা নিজেদের অজান্তেই কখন আউট সাইডার হয়ে গিয়েছে। এই ঘর এখন আর তাদের নয়, তাদের রুচির।

অনুতপ্তা

পৃথিবীটা গোল, এবং সম্ভবত সরকারী চাকরিও। নইলে ঘুরে ফিরে এই বঙ্গদেশে কেন কেবলই সেই খোড়বড়িখাড়া অফিসার মহলেরই সঙ্গে দেখা হবে। ম্যালচত্বরে সেই দণ্ডায়মান আড্ডাটি তখন বেশ ঘন হয়েছিল। সেই বিশুদ্ধ সরকারী বৃত্তটির চুম্বক কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছিলেন সেই রহস্যময়ী রূপসী ভদ্রমহিলা, যাঁর দিক থেকে চোখ ফেরানো প্রায় অসম্ভব। সকলেরই গোপন মনোযোগ সেই দিকেই। স্বচ্ছল শরীরে ভদ্রমহিলা উচ্ছল ঝর্নার মত অপরূপ ভঙ্গিমায় হাসছিলেন ; প্রায় কিশোরীর মত ছলকাচ্ছিলেন। যখন হাসছিলেন না তখনও ঠোঁটে একটা হাসির ছলনা লেগে থাকছিল, গালে চটুল টোল, ঠোঁটের কোলে কলঙ্কী তিলটা টুরিস্টব্যুরোর বিজ্ঞাপনের মত জ্বলছিল।

বৃহৎ হসন্ত চিহ্নের মত পশ্চাদ্দেশে মোষের শিঙের ছড়িটি ঠেকা দিয়ে সাব জজসাহেব দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাশেই পাটকেলী জাম্পার গায়ে শ্লিম ফিগার মিঃ বটানিক্যাল, বাহাত্তর ইঞ্চি পাইপের মত কেলেঙ্কারী রকমের একটা চুরুট ধরাতে ব্যস্ত, আমার দিকে তাকিয়ে

হাসলেন। মিঃ সিনহার মুখে প্রাক্তন বসন্তের মৃত চিহ্ন। আমি হেসে ঠাট্টা করে বললাম, 'এই যে মিঃ বসন্ত সেনা, আপনি এখনো দার্জিলিং-এ?'

চুরুট থেকে কয়েক দফা নীল ধোঁয়া উদ্গীর্ণ করে সিনহা সহাস্যে বললেন, 'অর্ধেক মানব আমি অর্ধেক ফসিল। দার্জিলিং-এ আট বছর হয়ে গেল আমার, লোয়ার পোরশন পাথর হয়ে গেছে, মশাই পাথর।'

বেপরোয়া ব্যাচিলার জিওলজিস্ট চারমিনার ফুঁকে সিগনেট রিং বানানোর এক্সপেরিমেণ্ট চালিয়ে যাচ্ছিলেন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রস না রসদ? কিসের খোঁজে?'

'কেস না কেচ্ছা?' মুখ থেকে স্মোকিং ব্যারেলখানা সরিয়ে প্রশ্ন পূরণ করলেন মিঃ বটানিক্যাল।

হেসে বললাম, 'ওসব কিছুনা। স্রেপ আপনাদের মতই ম্যাল-প্র্যাকটিস করতে।'

ম্যালপ্র্যাকটিস কথাটার প্রতিধ্বনি করে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলেন ভদ্রমহিলা। সুন্দরীর হাসি ফ্লুয়ের থেকেও ছোঁয়াচে, সাব-জজসাহেব পর্যন্ত সেই হাসি সংক্রামিত হয়ে গেল। রঙবেরঙের গুটিকতক জাপানী ছাতা হাতে নিয়ে মালান্তরে ফেরারিণী মহিলাদের জন্য প্রতীক্ষারত এ ডি সি এতক্ষণ ছত্রপতির মত দাঁড়িয়েছিলেন। তিনিও হাসলেন, হাসলেন আইভি তালুকদার, পুতুল পাকড়াশী, প্যারাম্বুলেটর ড্রাইভার অ্যাগ্রোনমিস্ট দত্তগুপ্ত। হাসলেন বো-টাইয়ের বক্লস্ বাঁধা শীলা দেবীর পদস্থ স্বামীটি।

আমার কৃতী সঙ্গী তাঁর সদ্য কেনা বোতলটিকে একখানা ডবল বহর আমেরিকান উইকলিতে ক্যামুফ্লেজ করে রাবীন্দ্রিক ভঙ্গীতে পিছনে দু হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবার কুর্নিশের মুদ্রায় মাথা ছুলিয়ে বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই, বাংলা দেশের কুলাঙ্গার লেখক ত্রিলোচন কলমচী। আর ইনি, মানে এই হাস্যকর মহিলা শ্রীমতী অনুতপা চট্টোপাধ্যায় ইনি ওস্তা স্বামী গ্রেট নিবারণ চাটুজ্জে। বাকি এনারা সবাই আপনার—'

'হাস্যকর মানেটা কি?' হাসি থামিয়ে শ্রীমতী অনুতপা ঈষৎ

'পরিচিত।' আমি বললাম, নমস্কার ঠুকতে ঠুকতে।

কুপিতার মত মুখোভঙ্গী করে বললেন। রাগলেও ভদ্রমহিলাকে রীতিমত উপভোগ্য লাগে।

'যিনি চা করেন তিনি যদি চাকর হতে পারেন, আপনি এন্তার হাস্য করেও হাস্যকর কেন হবেন না, ভেবে পাই না।' কৃতী সঙ্গী ব্যাখ্যান করলেন।

আমি কয়েক পলকের জন্য অনুতপার মাথা ডিঙিয়ে তাকালাম। দূরে হিমাচলী দিগন্তে তখন রঙ আর রেখার পাগল করা জ্যামিতি। কাছে দূরে ঠুংরি খেয়ালের মত কখনো মেঘ কুয়াশায় থেকে থেকে কানামাছি হয়ে দাঁড়াচ্ছে অতিকায় পাইন; অবাস্তব আর ঝাপসা দেখাচ্ছে সেই মুহূর্তের হার্বার্ট মল্লিক, অকস্‌ফোর্ড বুকশপ আর রাধা হোটেল। অশরীরী মনে হচ্ছে কাছের মানুষকে। দূরে লেবং রেসকোর্স, কোলাপ্স করা ঘোড়ার মত স্তব্ধ পড়ে আছে। পার্স প্যাশন-পার্সো-ন্যালিটি—এই তিন নিয়েই তো আফ্‌কাপ দার্জিলিং মানে আধলা পেয়ালার মত দেখতে এই শৈল-শহরটা।

বৃত্তটা ছোট হতেই, অর্থাৎ বেশ কয়েকজন একে একে খসে পড়লেই অনুতপা নিজে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন, 'আসুন না আমাদের বাড়িতে, একটু বেশ বসা যাবে। আপনাদের মত জ্যান্ত লেখকদের দেখা তো ভাগ্যে কদাচিৎ মেলে। আপনিও আসুন,—আমার সঙ্গীর দিকে ছলকে তাকালেন।

সঙ্গী চোখ টিপে বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। চলুন চাটুজ্জেদের হাতেই প্রথম বাঁশ খেয়ে আসি। পরিচিত বাঙালী মাত্রকেই উনি বাঁশ দিয়ে থাকেন। তাই আশা করা যাচ্ছে আপনিও বঞ্চিত হবেন না।'

বাঁশের রহস্য পরিষ্কার হল অনুতপাদের বাড়িতে গিয়ে। বৃহদাকার বাঁশের চোঙায় করে তুম্বা এল প্রত্যেকের জন্যে। তাতে গরম জল ঢালা হতেই আমরা নিজের নিজের চোঙা দুহাতে ধরে পরস্পরের সঙ্গে ঠোকাঠুকি করলাম। মিসেস চ্যাটার্জির হাসি অভ্যর্থনায় আমাদের পার্টি জমে উঠলো অল্প সময়ের মধ্যেই। নল মুখে দিয়ে দার্জিলিং-এর

সেই সাংস্কৃতিক পানীয় টানবার আগে এ ডি সি উঠে দাঁড়ালেন নাটকীয় ভঙ্গিতে টোষ্ট করতে। কবিতা আওড়ালেন, 'হিয়্যার ইজ দা হ্যাপিয়েস্ট ডেজ্ অব মাই লাইফ, স্পেন্ট ইন দা আর্মস্ অব অ্যানাদার ম্যানস্ ওয়াইফ, মাই মাদার।'

'গুড শট্!' শ্যামসুন্দর তারিফ করে উঠতেই সবাই সমস্বরে হেসে উঠলেন।

'হাউ ডেঞ্জারাস!' হাসির অর্কেষ্ট্রা ডিঙিয়ে অনুতপার সুরেলা গলা শোনা গেল 'ওমা দেখছ' কৃতী আমাকে চোখ মারলেন।

আমি চমকে কৃতীর মুখের দিকে তাকালাম, সে তখন নির্বিকার নিরীহ মুখে তুম্বার নল চুষছে। নিবারণ-বাবু অত্যন্ত লজ্জিত মুখে প্রাণপণে অন্য আলোচনা তুলতে ব্যস্ত। তাকে রেসকিউ করতে এগিয়ে এলেন শ্যাম-সুন্দর, 'অনেক স্ত্রীলোক তো দেখেছেন কলমচী মশায়, বলুন দেখি কোন্ স্ত্রীলোক সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে?'

'আমাকে?' ছুটি মাত্র চোখ কপালে তুলে জানতে চাইলাম আমি।

'সকলকেই।'

'পরস্ত্রীলোক।' আমি কৃত্রিম সঙ্কোচের সঙ্গে বলি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির লহরা খেলে গেল আবার। ছোট সঙ্গীতের মত উপলমুখর, হেসে গড়াতে লাগলো অনুতপা, আপনি নিশ্চয় ব্যাচিলার?'

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে, আমি সঙ্গীর কানে মুখ ছোঁয়ালাম, 'মেয়ে আর মার্জারি, ঘরের কোণে দুই-ই কিন্তু সমান মারাত্মক।'

শূন্যে শুধু ছোট্ট করে একটা তাচ্ছিল্যের 'ফুঃ' ছুঁড়লেন আমার সঙ্গীবর।

আরো কয়েকজন বিদায় নিলেন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তুম্বা আঁকড়ে আর ডালমুট চিবিয়ে পড়ে রইলাম আমরা।

শ্যামসুন্দর বললেন, 'একটা নাটক করলে হত।'

'নাটক কিছু কম হয়েছে নাকি?' আমি শুধাই।

'না না, তাৎক্ষণিক নাটক হলে মন্দ জমতো না।' এ ডি সি মন্তব্য করলেন, আসুন একটা আউট লাইন স্টোরি ভেবে নেওয়া যাক!'

অনুতপা করতালি দিয়ে উঠলেন, 'খুব মজা হয় তাহলে। আমি

খাবারের ব্যবস্থা করে আসি। এক মিনিট'—

'এক সেকেণ্ড।' অনুতপার গলা নকল ক'রে শ্যামসুন্দর বললেন 'তার আগে টেপ রেকর্ডার বের করে দিয়ে যান।'

পরদিন ডি এম ও এইচ-এর চেম্বারে কৃতী। সঙ্গীকে নিয়ে হাজির হলাম। তরুণ বাঙালী ডাক্তার হাসলেন, 'গড়বড় কিছু হয়েছে নাকি শরীরে?'

আমি বললাম, 'আমার এই ইয়ারবকসী কৃতী বাবুর কানে কিছু গোলমাল হয়েছে, ভালো শুনতে পাচ্ছেন না। যদি একটু টর্চ ফেলে দেখতেন—'

'হায়ার অল্‌টিচ্যুডে একরকম—'

'না হায়ার অলটিচ্যুডের ব্যাপার নয়, কাল মিসেস চ্যাটার্জির বাড়িতে পার্টি ছিল, সেখান থেকেই বাপারটা মানে ইয়ে একটা নাটকীয় মুহূর্তে'—

'ইয়ে করার কিছু নেই', ডি এমও হাসলেন, 'কি মশাই মিসেসের খুব কাছাকাছি গিয়ে পড়ে ছিলেন নাকি অসাবধান মুহূর্তে? ও হরি আপনি তো আবার কানে শুনতে পারেন না এসব।' বলে আমার দিকেই সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

'ব্যাপারটা তাই', আমি সসঙ্কোচে জানাই।

'হায়ার অলটিচ্যুডে উঠেছিলেন?' চোখ টিপে হাসলেন।

'কি করে বুঝলেন?' আমি হাসতে হাসতে শুধাই।

'আরে মশাই, সাধারণ মানুষের অগম্য জগম্য জায়গায়ও ডাক্তার মানুষ গিয়ে থাকেন। ইন্টিম্যাসির কথা বলছি। আমি দিন পনের মিসেস চ্যাটার্জির ট্রিটমেন্ট করেছিলাম কিনা। তাই জানি।'

'অব অল পার্সনস্ আপনিও?' আমি সহাস্যে জিগ্যেস করি।

'হ্যাঁ। আমার কানেও একবার ফু দিয়েছিলেন শ্রীমতী। ফলে পুরো একটি দিন ইয়ার লক।'

কু কথার বদলে কানে ফু দেওয়া অনেক ভালো, আমার সেই মুহূর্তে মনে হল।

নায়িকা

সেদিন সন্ধ্যায় মেড়ো ব্যাঙ্কে তরুণ ভট্টাচার্যের ঘরে বসে ছিলাম এমন সময় হুড়মুড় করে শ্যামসুন্দর এসে ঢুকলো। আমাকে দেখেই সচিৎকারে ঘোষণা করল, আই সাবাশ! মিল্ গিয়া—'

'কি মিললো হে?' আমি জিগ্যেস করলাম অবাক হয়ে।

'আমাদের নাটকের হিরো, আবার কি। নাও নাও গা তোলো—' তারপর তরুণের দিকে একরাউণ্ড ঘুরে গিয়ে বলল, 'ওহে তরুণ, জলদি জলদি খান দুই কম্বল নিকালো'—

'হিরো ওয়ার্শীপের নমুনা তো ভালই দেখছি', আমি ঠাট্টার সুরে বললাম, 'কম্বল ধোলাই হবে নাকি শেষ পর্যন্ত?'

নিরুত্তর শ্যামসুন্দর কম্বল সমেত আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে তার জীপ গাড়িতে ওঠালো, তারপর স্টার্ট নিতে নিতে বলল, 'আজ আমার ওখানে রাত্রিবাস করবে।'

আসল বৃত্তান্তটি শুনলাম আরও মাইল খানেক ডাউন নেমে। শ্যামসুন্দরের বন্ধুর এক পিসতুতো দাদা নাকি ওর ওখানে, মানে রংগীরুম বনবাংলোয় হনিমুন যাপন করতে এসে উঠেছেন। বয়সের দিক থেকে তাকে লেটকামারই বলা চলে, ছত্রিশ বছর বয়সে প্রথম সাতপাকের বন্ধন। তা হোক, চাঁদের জন্যে 'এজ্ বার' কিছু আছে বলে তো মনে হয় না!

কিন্তু ফ্যাসাদ বেঁধেছে অন্যখানে। দাদা এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে রংগীরুমে কেন যে এলেন, বৌদির মনে গোড়াগুড়িই কেমন একটা সন্দেহ ছিল। বনবিভাগের সবচেয়ে পুরনো, বাংলো হতে পারে রংগীরুম, প্রাক্তন বটানিক্যাল গার্ডেনের কিউরেটারের খাস কুটীব ছিল এই একশো বছরের বুড়ো বাংলোটি, তাও স্বীকার। এর চারধারে ওয়ালনাট্ ইউক্যালিপটাস, আর সুপার পাইনের ব্যূহ, আর নির্জনতা আর পিক্ রেঞ্জ, আর জমাট জঙ্গল। আলোছায়ার সেই নকশী কাথায় পা টিপে আসা হরিণের পাল চমক লাগায় ঠিকই তবু কোথায় যেন একটা তবু থেকে গিয়েছিল বৌদির মনে।

এখানে দাদার নাকি এই প্রথম না। যৌবনে আর একবার এসেছিলেন এখানে। সে সময়—ক্যায়সা চাঁদ ছিল আকাশে, কি মার্ডারাস বিউটি ছিল তামাম জঙ্গলের—কি সব মাথা-খাওয়া পাখি ডাকতো সারারাত ধ'রে তখন—সেরেফ এই কথাগুলোই দাদা কবিত্ব ক'রে ঢেলেছিলেন বৌদিদির কানে।

'ব্যস!' শ্যামসুন্দর স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ওই-খানেই স্টাম্পড্ আউট হয়ে গেলেন দাদা।'

জীর্ণ ভিজিটার্স বুকের পাতা উল্টে উল্টে বৌদি দাদাকে বামালসুদ্ধু ধ'রে ফেললেন অতঃপর। সন-তারিখে মিলে গেল। শুধু আসা আর যাওয়ার সময়ে সামান্য ফারাক রয়েছে দেখা গেল। কিন্তু সেটা যে চোখের ধুলো নয় তাইবা হলফ্ করে কে বলবে? নইলে বনানী দত্ত সোনালী হাজরা আর পার্বতী সুর—এই ত্র্যহস্পর্শ যে এখানে বিনি মতলবে আসেনি, সে কি আর ব'লে দিতে হয়? বৌদি

জলবৎ বুঝে নিলেন সবই। অমন ডাগর ডাগর তিনটে নাম সইয়ের তলায় সবুজ কালিতে দাদার ছ'লাইনের স্বরচিত কবিতা কী আর অমনি অমনি জন্মলাভ করেছে! অন্য ঘরেই থাকুক আর যে জন্যেই আসুক তলায় তলায় যে একটা বিলক্ষণ যোগসাজস ছিল বৌদি তা অনুমান করে নিলেন।

সেই থেকে লাইফ হেল হয়ে উঠেছে দাদার। পুলিশে ছুলে যদি আঠারো ঘা, স্ত্রীর মনে সন্দেহ ঢুকলে তবে বুঝি লিউকোমিয়া। বনানী-সোনালী-পার্বতী এদের মধ্যে কে এবং এরা কারা কোথায় কেন কি ব্যাপার—বৌদির কণ্ঠে স্ত্রীভি জ্ঞাসা উল্টোপাল্টা ধারালো ক্ষুরের মত হয়ে ওঠে। দাদা নিরুপায় এবং নীরব। সুতরাং ফোঁসফোঁসানি আর ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্না আর চোখ কপালে তুলে গোঙানী। চাঁদ শিকেয় উঠেছে, আপাতত হিস্টেরিক বৌদিকে তবিয়তে সামলাতেই দাদা মুক্তকচ্ছ হয়ে গিয়েছেন। পাশের কামরায় বসেও আজ কদিন অফিসের কাজকর্ম করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে শ্যামসুন্দরের। সম্পর্কে দাদা-বৌদি সুতরাং এ ব্যাপারে নাক গলানোও চলে না, তাছাড়া ব্যাপারটা খুবই যখন ডেলিকেট। তাই অগত্যা ও প্ল্যান করেছে আমাকে দিয়ে বৌদির পুরাতন প্রেমিকের অভিনয় করাবে। এনি হাউ বৌদির উইক পয়েন্ট ক্রিয়েট করতে হ'বে।

'না ব্রাদার অন্যায় কর্ম আমার দ্বারা হবে না।' আমি করুণ কণ্ঠে মিনতি করি ফলস প্রেম করতে গিয়ে কি শেষে বেঘোরে মারা পড়বো?'

'ওয়ার আণ্ড লাভ অ্যাফেয়ারে অন্যায় বলে কিছু নেই।' আমাকে জ্ঞান দিল শ্যামসুন্দর, 'তাছাড়া মারা পড়ার কোনো ভয় নেই। কারণ প্রেমে পতন আছে, মূর্ছা আছে কিন্তু মৃত্যু নেই'—আমাকে আর কোনো কিন্তু করতে না দিয়ে একমহলা তালিম দিয়ে দিল শ্যামসুন্দর। আমার জ্ঞাতব্য তথ্য আমার সম্ভাব্য সংলাপ শ্যামসুন্দর আমাকে পাখি পাড়িয়ে রাখলো। আমার মত কেবলুস শেষ পর্যন্ত না সব ভেস্তে দেয় এই একমাত্র ওর আশংকা ছিল।

খাবার টেবিলে সাক্ষাৎ হলো। টেবিলের একপ্রান্তে দীর্ঘাঙ্গী মোমের মত। ঈজিপ্সিয়ান ছাঁদের মুখ, মন্থলস চোখের তারা। আমার বুকের ভেতরটা অবেলায় পিড়িং পিড়িং করে উঠলো।

শ্যামসুন্দর কেতামাফিক আগে দাদার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল, পরে বৌদিদির সঙ্গে! আমার নাম শুনলাম মিস্টার ঘোষাল। কর্মসূত্রে কলকাতা থেকে এসেছি শ্যামসুন্দরের অন্ত পরিচিত এবং একরাত্রের নিরুপায় অতিথি। আমি এই শীতেও ভদ্র-মহিলার স্লীভলেস বাহুযুগলের দিকে তাকিয়ে চমৎকৃত হলাম। রিনরিনে গলায় বললেন, 'নমস্কার।'

আমি হাতে নমস্কার করলাম কিন্তু মুখে বললাম, 'স্ট্রেঞ্জ কোয়েন্সি-ডেন্স মিসেস চক্রবর্তী। আপনার নাম নিশ্চয়ই চারুলতা নয়, আই মীন, চারুলতা সান্যাল ছিল না কোনো দিন। পূর্ব পুটিয়ারীতে কলেজ লাইফ নিশ্চয় কাটেনি আপনার। অথচ দেখুন—'

'শুনছেন?' কাঁপাকাঁপা গলায় দুলে উঠলেন রূপসী শিখাটি, 'কী আশ্চর্য মিস্টার ঘোষাল, আমার নাম সত্যিই চারুলতা। আমি সান্যাল ছিলাম বিয়ের আগে এবং পূর্ব পুটিয়ারীতেই ছিলাম। অথচ—

'যাক্ তবু স্বীকার করলে যা হোক' বলেই আড়চোখে ওঁর স্তম্ভিত স্বামীটির মুখের দিকে একবার দেখে নিলাম, 'বিয়ের পর যা বদলে গিয়েছ বুলু, ভয় হয়েছিল পুরানো দিনের কথা ভাবতেই চাইবে না। মেয়েরা যা ট্রেচারাস হয় এ ব্যাপারে—'

'একস্কিউজ মি—ক্ষুব্ধ-বিরক্ত-বিস্মিত মিঃ চক্রবর্তী আমাকে বাধা দেবার চেষ্টা করতেই আমি জোড়হাত করে করুণ মিনতি করলাম প্লিজ। সাত বছরের পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে বাইচান্স দেখা হয়ে গিয়েছে—একটু চান্স দিন একটু কথা বলি। আপনাদের তো সারাজীবন পড়েই রয়েছে—আচ্ছা বুলু।'

বুলু ওরফে চারুলতার তখন মুখ চোখ হোয়াইটপ্রিন্টের মত ফর্সা মেরে গেছে। আবছা অস্ফুটপ্রায় গলায় মিসেস বললেন, 'আপনি আলতু-ফালতু কিসব বকছেন মিঃ ঘোষাল।'

আমি বললাম, 'তা বটে। আমি আলতু-ফালতুই বটে। প্রেম জিনিসটার কোনো মূল্যই নেই তোমাদের কাছে। ও হচ্ছে তোমাদের কুমারী জীবনের হবি মাত্র।'

'মিথ্যে কথা! আমি আপনাকে চিনি না।' চারুলতা এতক্ষণে কথা তুললেন।

'তোমাকে চিনতে আমারও ঘৃণা বোধ হয়।' আমার উত্তেজিত কণ্ঠ।

'মিঃ ঘোষাল!' শ্যামসুন্দরের গর্জনে সত্যিই আমার পিলে চমকে উঠলো 'আপনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করছেন মশায়! বলি নেশা-টেশা কিছু করে এসেছেন নাকি!"

'নেশা!' আমি প্রথমে আকাশ থেকে পড়ি, তারপর বলি, 'হ্যাঁ নেশাই করেছিলাম একদিন। তবে আজ না' পকেট থেকে একতাড়া মুখছেড়া এনভেলাপ একটুখানি বের করেই আবার লুকিয়ে রাখতে রাখতে বললাম নেশার সরঞ্জামই বয়ে বেড়াচ্ছি যখের মত। শুধু যার জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দেব বলে—'

'শ্যাট আপ?' মিঃ চক্রবর্তী তেড়ে ফুড়ে উঠলেন এইবার।

আমিও চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালাম। 'শ্যামসুন্দর বাবু যথেষ্ট হয়েছে, এক মুহূর্তও এখানে থাকবার অভিরুচি আমার নেই।'

পরমুহূর্তেই আমি ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে একেবারে বাংলোর বারান্দায় এবং সেখান থেকে অন্ধকার ক্যামপাস পেরিয়ে দ্রুতপদে বুনো পথে এসে দাঁড়িয়েছি। পিছনে সোরগোল। ভদ্রমহিলা কাতর কণ্ঠে বার দুই আমাকে সম্ভবত ডেকেও ছিলেন।

নাটকের শেষটা এরকম ভাবা ছিল না। গিয়েছিলাম রাত্রিবাস করতেই কিন্তু ঝোঁকের মাথায় পরিকল্পনা ভণ্ডুল করে বেরিয়ে এলাম। কিছুক্ষণ পরেই লিফট পেয়েছিলাম অবশ্য। অনাহারী কলমচীকে শহরে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল শ্যামসুন্দর। আমার অভিনয় আর ডিসিসনের তারিফ করতে করতে।

চারুলতা চক্রবর্তী নাকি সেই থেকেই আমাকে খুঁজছেন। শ্যাম-সুন্দরের মুখে খবর পাই মাঝে মাঝে। দাদাও আর দাম্পত্য ট্রাবলে পড়েননি।

যুবতী বিষয়ক

"থোড়া নিমক মাঙতে হেঁ" খোড়া হিন্দিতে সবে স্মার্ট হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি এমন সময় খিল খিল হাসি উঠল। প্রবীণ ভদ্রলোক এবং প্রৌঢ়া ভদ্র মহিলার ভর্ৎসনাও শুনতে পেলাম সঙ্গে সঙ্গে, 'কি হচ্ছে লিলি! সব সময় অসভ্যতা—'

আমি টাল সামলে নিয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে জানালাম, 'একটু লবণ, মানে নুন'—

'—মানে সল্ট,' লিলি নামক মেয়েটি তার ইমিটেশন কম্বলের তলা থেকে টিপ্পনী কাটলো 'দাদুরী মানে ব্যাঙ, মানে ভ্যাক, মানে ফ্রগ,— —বুঝেছি মশায়!'

'আঃ!' এবারে আর একটি মুখ ভেসে উঠলো। নাইলনের কম্বলের বাইরে শ্বেতপদ্মের কলির মত।

প্রবীণ অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে আমাকে বললেন, 'ব্যাপার হয়েছে, আমাদের ট্রাঙ্কের চাবি হারিয়ে গিয়ে খুব অসুবিধেয় পড়েছি—চায়ের সরঞ্জাম মায় নুন পর্যন্ত ওর মধ্যে। আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছে থেকে—আচ্ছা ইয়েল লকের কোনো চাবিটাবি আপনাদের কাছে আছে?'

নিজের ভুল বুঝতে পারলাম। এ ঘরের উত্তর ভারতীয় বাসিন্দারা কাল রাতেই বোধ করি চলে গিয়েছেন, তার জায়গায় এই বাঙালী পরিবার এসেছেন। ধর্মশালা মানেই পাখির বাসা। শুধু বেডিং বাঁধা আর খোলার ওয়াস্তা। এই হৈচৈ এই চুপচাপ। আমার ভ্রমণ বিলাসী ক্ষ্যাপা বন্ধু রাত এগারটায় তার মর্জিমাফিক খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে আবিষ্কার করল ঘরে নুন নেই। তাই অগত্যা এই লবণ-অভিযান।

এ ঘরের সবাই সারিসারি শুয়ে পড়েছিলেন, ঘুমিয়েও পড়েছিলেন কিনা তাই বা কে জানে। দরজায় গাট্টা মেরে ওদের আমি তুলেছি।

সারিসারি বিছানায়, পর পর সবাই শায়িত কেবল বৃদ্ধ ভদ্রলোক উঠে বসেছেন গায়ে শাল জড়িয়ে। দরজার পাশেই তাঁর বিছানা। তাই হাত বাড়িয়ে নীচের দিকের ছিটকিনিটা খুলেছেন বসে বসেই। আসলে এদিকে কোনো জানলা না থাকায় আমি ওদের শয়নপর্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলাম না। ছি ছি!

অসময়ে বিরক্ত করার জন্যে ক্ষমা চেয়ে ঘরের দিকে ফিরে যেতে যেতে বললাম 'আচ্ছা দেখি, কাল সকালে চাবি পড়িয়ে দেব।'

ঘরে ঢুকে দেখি বন্ধু হাঁড়িতে হাতা নাড়তে নাড়তে গাইছে, 'বিশ্ব হতে হারিয়ে গেছে ইয়েল লকের চাবি, খিচুড়ি রেঁধে তাই তো ভাবি কেউ কখনো খুঁজে কি পায় ভদ্রলোকের চাবি—'

বুঝলাম দরজার পাশ থেকে আড়ি পেতে শ্রীমান সব শুনে ফেলেছে। রেগে গিয়ে বললাম, 'ফক্কুড়ি রেখে কী হোল্ডারটা বের কর, ইয়েলের'—

'তোমার হৃদয়ের জংধরা তালা,' মনোযোগ দিয়ে হাতায় তোলা খিচুড়ির ঘ্রাণ নিতে নিতে বলল, 'এ চাবিতে খুলবে না ব্রাদার, দুসরি চাবির প্রয়োজন—'

কোনো চাবিতেই শেষ পর্যন্ত তালা খুললো না। কিন্তু মন খুলে গেল। প্রথম সাক্ষাতে যাকে পয়লা নম্বরের ফাজিল মনে হয়েছিল সেই লিলিকেও অন্য মূর্তিতে দেখলাম। একটু ছটফটে, বছর কুড়ি একুশ বয়সেও একটু কিশোরী কিশোরী ভাব লিলির। কিন্তু মেয়েটি ভালো এবং সরল। শ্বেতপদ্মের কলির মত মুখ, লাবণ্য ওর চার বছরের বড় দিদি হলেও চালচলনে ঠিক যেন ওর উল্টোপিঠ। অত্যন্ত লাজুক আর চাপা স্বভাবের। চোখের দিকে তাকালেই মনে হয় বুকের মধ্যে কোথাও গভীরতা আছে।

হরকি প্যায়ারির উল্টোদিকে ব্রীজের তলায় বসে গুলিখোর বৃহদাকার মহাশোল মাছের ঝাঁককে ময়দা খাওয়াচ্ছিল লিলি। লাবণ্য অবাক হয়ে চুপ করে তাই দেখছিল।

'দেখছ কি, লাবণ্য' আমি বললাম 'এইসব মাছের পেট কাটলে

হয়ত কালিদাসী আংটি বেরোতে পারে এক আধটা।'

'—অভিজ্ঞান অঙ্গুরী?' প্রশ্নচ্ছলে ম্লান একটু হাসলো লাবণ্য। ও আবার সংস্কৃত নিয়ে এম এ পড়ছে কলকাতায়।

গঙ্গার স্ফটিক সবুজ জল প্রবল বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে ব্রীজের নীচে দিয়ে আর সেই সফেন স্রোতের উজানে শয়ে শয়ে মাছ এসে ভিড় করে দাঁড়াচ্ছে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তারপরেই আবার স্রোতে গা ভাসিয়ে পিছনে হারিয়ে যাচ্ছে কোথায়। আমাদের মুহূর্তগুলোও এই মাছের মতই, কালের স্রোতের মধ্যে বৃথাই লহমায় লহমায় দাঁড়াবার চেষ্টা।

'লাবণ্য?'

'উঁ?' গায়ের শালখানা ভালো করে জড়িয়ে বসতে বসতে ও অন্য-মনস্ক উত্তর দিল। জলের ধারে বেশ শীত করছে এখন। লাবণ্যের দিকে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই মনটা তার এই মুহূর্তে কোথায় আছে। ওদের বৌবাজারের বাড়ির ছাতে না কি মেহেরচাঁদ ধর্মশালার ঘরখানার মধ্যে নাকি এই ফ্লাইং ফক্স আইল্যাণ্ডের আনাচে কানাচে।

বললাম, 'মনসা পাহাড়ে কথা দিয়েছিলে গান শোনাবে। কই শোনাও একখানা গান?'

লিলি হেসে হাততালি দিয়ে উঠলো উৎসাহে, 'পাবলিক নিয়ে নেবে তোকে দিদি—গা গলা খুলে একখানা। রবীন্দ্রনাথ ধর দিকি। জানেন দাদা', আমার দিকে চোখ টিপে লিলি বলল, 'ওই আমাদের ফ্যামিলিতে বেস্ট গানার।'

ওর কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে বললাম, 'আর তুমি কি?'

'মেশিন গানার,' সপ্রতিভ দ্রুত গলায় বলল লিলি।

'সেতার না গীটার, কি বাজাও?'

'গ্রামোফোন মশাই গ্রামোফোন। টেলিফোনও বাজিয়ে থাকি মধ্যেসধ্যে।'

লাবণ্য ওকে চিমটি কেটে বলল, 'তুই থামবি মুখপুড়ী?'

'তুই শুরু করলেই থামবো। উঃ! থেমেই তো আছি বাবা! দাদা, গান ফরমাস করুন ঝট করে।'

'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, কেমন হয়?'

লিলি প্রায় বিষম খেয়ে হেসে উঠল খিলখিলিয়ে, 'আই বাপ, তোর সেই গান রে, দিদি! হিঃ হিঃ হিঃ—'

'কোন গান? কি ব্যাপার?' আমি জানতে চাই।

লিলি সোচ্ছ্বাসে বলতে যাচ্ছিল লাবণ্য চোখে চোখে ওকে ধমকালো।

'আচ্ছা রে বাবা আচ্ছা! আমার কাছ থেকে কিছু আউট হবে না তোর।'

'কোনো রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার নিশ্চয়? তবে থাক। আমি কিন্তু অন্য কারণে গানটা শুনতে চেয়েছিলাম।'

'কি কারণ? কি কারণ?' আমার-মাথা নাড়া অগ্রাহ্য করে লিলি দাবী জানালো, 'না বলুন, বলতেই হবে।'

বলতে গিয়েও হঠাৎ থমকে গেলাম আমি। শিউরে উঠলাম। এ আমি কি করছি জলের ধারে চুপি চুপি দুটি নাতি যুবতী মেয়ের সঙ্গে বসে। আমিও কি স্রোতের কুটো ধরছি? আমিও কি অঞ্জলি হয়ে গেলাম নাকি। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'না চলো বড্ড শীত করছে।'

পরশু দিনের দৃশ্যটা চোখের ওপর ভেসে উঠলো আবার। ব্রহ্মকুণ্ডের গম্বুজ-ঘড়ি যদিও চোখ কপালে তুলে বারোটা কুড়ি হয়ে আছে কিন্তু আসলে তখন রাত সাতটা পঁয়তাল্লিশ। গঙ্গা মন্দিরের আরতি সবে শেষ হয়েছে। ফিরছিলাম। ব্রীজ পেরিয়েই চোখে পড়লো সবুজ পাড়ের শাড়িপরা গুটি পঞ্চাশ মেয়ে গঙ্গার ধারে সারি সারি দিয়ে দাঁড়িয়েছে। দিদিমণিরা টিফিন প্যাকেট তুলে দিচ্ছেন হাতে হাতে। কোনো স্কুল থেকে একসকার্শ্যানে এসেছে বোধ হয়। ওদের প্যার হয়ে কয়েক গজ যেতেই চোখে পড়লো সামনে গার্ড অব অনারের ভঙ্গিতে পাশাপাশি দুটি মূর্তি ঋজু হয়ে হেঁটে চলেছে। ধীরে অতি ধীরে এবং নিঃশব্দে। প্রথমে নিঃশব্দেই মনে হয়েছিল। একজন

পুরুষ অন্যজন মহিলা। মহিলার যৌবনে অপরাহ্ন এসেছে। পরনে সবুজ পাড়ের কল্কা-দার শাড়ি, কোঁকড়া চুল, চোখে সোনালী চশমা। সঙ্গীর বয়স ত্রিশের দু'তিন ধাপ নিচে। সাদা সার্ট ট্রাউজার্স চোখে চশমা। গান গাইছিল সেই। গুনগুন করে অস্বাভাবিক চাপা গলায়। পাশাপাশি পৌঁছে চিনলাম গানটা, 'তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা—' এখন সেই বয়স যখন কাছেরটা ঝাপসা দূরেরটা স্পষ্ট! এখন সেই বেলা। একজন হয়ত দোর্দণ্ড প্রতাপ হেডমিস্ট্রেস তারই অন্তত বারো বছরের জুনিয়র সহ-কর্মীর গলায় প্রায় চুরি করে গান শুনছেন।

মুখের দিকে ভালো করে তাকাতে গিয়েই চমকে গিয়েছিলাম আমি, চোদ্দ বছর পর অঞ্জলির এই করুণ মূর্তি দেখে।

স্ত্রী ভূমিকা

এ জি বেঙ্গলের কাগের বাসায় সুকণ্ঠী কণিকা 'বসুরায়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল আমার। সুন্দর চেহারা। বিবাহিতা। কিন্তু বিবাহিতাদের মত মন্থর হয়ে যাননি ভদ্রমহিলা। ক্রনিক অ্যানিমিয়া নেই চরিত্রে। আমি তখন কুক-মি-কুইক গল্প কন্যাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি। অর্থাৎ অপরিচিত মেয়েদের সঙ্গে অযাচিত আলাপ করাই তখন আমার হবিস্ত 'হবি'।

কণিকার রেসপন্স-খুব কুইক। দ্বিতীয় দিনেই কার্জন পার্কের নির্জনতম কোণটিতে হাতের ইংরেজী খবরকাগজখানা বিছিয়ে বসে গেলেন। বিশুদ্ধ ঘাসে তাঁর তেমন আসক্তি নেই। কিন্তু মুখোমুখী নরনারীর গল্পে ঘাসের একটা অনিবার্য ভূমিকা আছে, ছাত্রাবস্থা থেকেই সেটা জানি। আমি তাই পছন্দমত একটা লম্বাঘাসের ডাঁটি ছিঁড়ে নিয়ে দাঁতে কাটতে শুরু করলাম। পুরুষরা ঘাসে মুখ দিলে মেয়েরা নাকি খুব লাইক করে। দেখলাম কথাটা খুব মিথ্যে নয়।

সমাজ্ঞীর মত ইংরেজি কাগজের ফ্রন্ট পেজ জুড়ে বসেছেন কণিকা বসুরায়। বেশ কায়দা করেই। কোলের কাছে ফোম-লেদারের কিম্ভূতাকারের একটি মডার্ন হাতব্যাগ পিকীনীজ কুকুরের মত খাড়া।

ডালিম ফুলের মত লাল টুকটুকে অধরোষ্ঠে ঈষৎ স্ফুরিত হাসি। সবুজ সানগ্লাসের তলায় রহস্যময় চাউনি। আমার ঘাস খাওয়াই সম্ভবত তারিফ করছেন।

দু-চারটে মর্মস্পর্শী সংলাপ ছাড়তেই বসুরায়ের বসার কায়দা বদলালো। নেমন্তন্ন খাওয়ায় ভঙ্গিতে সামনে বাঁ হাতের ঠেকা দিয়ে ঝুঁকে বসলেন।

'—আপনাকে এত ভালো লাগছে কেন বলুন তো?' জবাব দেবার অবসর না দিয়ে আমিই একসঙ্গে প্রশ্নোত্তর করি 'আপনি সুন্দরী সেইজন্যে? উঁহুঁ সুন্দরী মেয়ে আমি এর আগেও বহু দেখেছি।'

মনে মনে জানলাম চার নম্বর বি বি দিয়ে ফায়ার করেছি, এবং ফায়ার করেছি রেঞ্জের মধ্যেই। সুতরাং ধোঁয়া সরে গেলেই ফলাফল চক্ষুগোচর হবে। হলও। একটু পরেই অন্য প্রসঙ্গে বসুরায় নিবিড় হয়ে এলেন। অ্যামেচার প্রেমিক প্রেমিকার মত সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটার লক্ষ চক্ষু এবং কোটি চিৎকার উপেক্ষা করে ট্রাম বাস ট্যাক্সির হার্ডল রেসে তালাক দিয়ে সমাধিস্থ হয়ে বসে থাকলাম। সেই মুহূর্তে আমাদের কাছে সমাজ সংসার সব মিথ্যে, জীবন-জীবিকার জিমন্যাস্টিক কসরৎ অতিভ্রম।

সব মানুষেরই ভেতরটা কিছু লেজার-ফাইল-বিল-ভাউচার হয়ে যায় নি। হয়ে যায় নি রং ছুট নিংড়ানো কার্বন, ব্রীফের নির্মম ব্রাসিয়ারে বাঁধা পড়ে যায়নি সব মানুষের গোপন কথা। মানুষ এখনো রূপকথায় এবং রোমান্সে বেঁচে আছে।

বসুরায় সহজেই তাঁর ঘরের কথায় এলেন। মানে স্বামীর কথায়। স্বামী নাকি অত্যন্ত কড়া-মনুষ্য। ভেতরে ভেতরে সন্দেহপ্রবণ। কারো সঙ্গে স্ত্রীর মেলা মেশা তিনি আদতে পছন্দ করেন না। এইভাবে যে তিনি আমার সঙ্গে হুমড়ি খেয়ে বসে গল্প করছেন একবার যদি মিস্টার বসুরায়ের চোখে পড়ে যেত। উফ্! ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়। শিউরে উঠে বহুরে ইঞ্চি কয়েক ব্রিজ

করে গেলেন মনে হল।

আমি তৃতীয় দফা ঘাস ছিঁড়তে গিয়েও থেমে গেলাম, 'চোখে পড়ে গেলে কি হত মিসেস বসুরায়?'

'ওরে বাপ! তাহলে কুরুক্ষেত্র বাধত।' খঞ্জন নয়নে আমার দিকে কয়েকটি পলক নিক্ষেপ করে তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'মানুষটা হয়েছে যাকে বলে বিদকুটে বেরসিক। যেমন জোয়ান জবরদস্ত চেহারা, তেমনি মিলিটারী খোট্টাই মেজাজ। অমি যে কি ভয়ে ভয়ে থাকি আপনাকে কি বলব।'

সত্যি তাহলে তো আমি ধড়ফড় করে উঠি 'এভাবে গল্প করা ভারি রিস্কি! এর থেকে কোনো নিরিবিলি রেস্তোরাঁ কেবিন ঢের ভালো। চলুন উঠি—উঠে পড়ি।'

'হ্যাঁ ওঠা যাক' মণিবন্ধের সোনালী বিন্দুতে এক নজর তাকিয়ে কণিকা বললেন, 'এবার বাড়ি ফিরতে হবে। আবার সেই খাড়া বড়ি থোড়। সত্যি লাইফ হেল হয়ে গেল আমার!'

কণিকার সঙ্গে আড্ডা দেওয়া এতদিন যদিবা রিস্কি ছিল, এবার ভারি কস্টলি হয়ে উঠলো। নিত্যি নতুন রেস্তোরাঁয় অফিস ছুটির পরের এক দেড়ঘণ্টা কাটানো। কিন্তু যতই আড়ালে যাই কণিকার স্বামীকে এড়ানো অসম্ভব। আমাদের অবসর গল্প গল্পান্তর জুড়ে থাকে রূপকথার দৈত্যের মত কণিকার স্বামী। মানে স্বামীর প্রসঙ্গ। তার হুজ্জুৎ তার আদিখ্যেতা, তার সর্বক্ষণের দাবী দাওয়া।

কণিকার স্বামীর মত জাঁদরেল অফিসার নিশ্চয় অনেক আছেন, কিন্তু কণিকার মত স্ত্রী কটি আছেন কলি-যুগের কলকাতায়, তা জানা নেই। এমন শিক্ষিতা সুন্দরী আধুনিকা এবং অধিকন্তু চাকুরিণীরা স্বামীকে দেখে জুজু হয়ে থাকেন, ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা সুখসৌখিনতা এবং শখের বন্ধু বিসর্জন দিয়ে, অফিস আওয়ার্সের পরেও অ্যানাদার এইট আওয়ার্স মানে অষ্ট প্রহর ওভার টাইম, ম্যাক্স ফ্যাক্টর মুছে জনতায়-ডালদায় একাকার হওয়া যে অভাবনীয়! ঘরণী এবং ঘরামী এক সঙ্গে। কণিকার মত প্রাণবন্ত মেয়ের এমন হিপনোটাইজড

পরিণতি ভাবতে (পরস্ত্রী বলেই বোধ হয়) ভারি কষ্ট লাগে।

কিন্তু যতই ভয় করুক কণিকা, যতই মেনে চলুক, এই ভায়োলেণ্ট স্বামী তার যে খুব না-পছন্দ তাতে আমার ঘোর সন্দেহ আছে। দুই মনা মেয়েরা বর এবং বর্বর দুই-ই খোঁজে। স্থূলরসিকের প্রতি স্থিতি স্থাপক অনুগ্রহ আছে মেয়ে জাতের বরাবরের। 'ওয়াইল্ড' মেয়েদের কাছে গুণবাচক বিশেষণ। প্রাগ-বিবাহে মসৃণ পুরুষ 'মিস'-ফিট করলেও পরে মিসেসদের বেলায় তেমন ফিট করে না। কণিকাকে তাই আমি বেশ মনে মনে উপভোগ করছিলাম। তার উচ্ছ্বাস এবং তার অবৈধ সুখের আতঙ্ক।

বালীগঞ্জ অঞ্চলের এক সিনেমা হলে দীর্ঘ এক বছর বাদে ক্যাচ-আউট হলেন খাস্তদা। আহিরীটোলা পাড়ার খাস্তদা এই এক বছর পাড়া থেকে, কলকাতা শহর থেকে মায় পৃথিবী থেকেই বোধকরি কর্পূরের মত উবে গিয়েছিলেন। বহু তত্ত্ব তল্লাস করে, থানায় ডায়েরী করে, কাগজে 'ফিরে এসো' কলমে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো হিল্লে হয়নি। আমরা তাঁকে খরচের খাতায়ই জমা করে নিয়েছিলাম। চাকুরিটি যাবার পর থেকে কি যে হতো খাস্তদার!

একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে নিবিড়-ভাবে ছবি দেখছিলেন খাস্তদা। বুঝলাম গোপনে বিবাহ সেরে নিয়েছেন। জনগনমন হয়ে যাবার পরে কপাৎ করে খাস্তদার হাতখানা ধরে ফেললাম, 'একেবারে বমাল সুদ্ধু।'

মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল! বিড়বিড় করে কি যেন বলে পালাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আমি নাছাড়া। অবশেষে হতাশ গলায় বললেন, 'তবে আয়, আমার আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে।' অমি তো বর্তে গেলাম কিন্তু পিছন ফিরে দেখি ভদ্রমহিলা হাওয়া!

'একি! বৌদি কোথায়?'

ইতস্ততঃ করে বললেন, 'উনি পাশের বাড়ির। তোর বৌদি এখনো অফিস থেকে ফেরেননি! তারপর খপ করে মানতের ভঙ্গিতে হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, 'দোহাই ভাই, কথাটা যেন ফাঁস না হয়, তোর বৌদি তাহলে'—

জিভ কেটে বললাম, 'রামঃ!' মনে মনে ভাবলাম, কালই কেচ্ছাখানা কালি ছিটিয়ে খোলতাই করতে হবে।

খাস্তদা বাড়ি ফিরেই ঝটিতে দেহে লুঙ্গি গলিয়ে নিয়ে ময়দা মাখতে বসলেন। স্ত্রী ফেরার আগে আগেই জল খাবার রেডি রাখতে হবে নইলে তিনি নাকি একটু হট টেম্পার আছেন!

ঘড়ির দিকে ঘন ঘন তাকানো দেখেই সেটা বুঝেছিলাম। খাস্তদা অন্যথায় দিব্য আছেন। দশটা পাঁচটা করতে হয় না। কোনো দায় দায়িত্ব নেই। শুধু ঘরদোর আগলানো। তবে কাচ্চাবাচ্চা এলে একটু প্রেসার বেড়ে যাবে, অবিশ্যি দু-এক বছরের মধ্যে তেমন কোনো আণ্ডার স্ট্যাণ্ডিং নেই।

এক পেয়ালা চা খাইয়ে খাস্তদা বললেন, 'আজ যা ভাই কাল আবার দুপুরে আসিস। যখনই আসবি দুপুরেই আসবি কেমন। তোরা হচ্ছিস পাড়ার ছেলে, তোরা আমার কত আপনার।'

কিন্তু বাঘের ভয় অনুসারেই সন্ধ্যে হয় প্রবাদ। হলও তাই! আমরাও সদর খুলেছি আমাদের খাস্ত বৌদিও বিফোর টাইমে দরজার ওপিঠে তক্ষুনি পৌঁছেচেন। খাস্তদার মুখ কাগজের মত ফ্যাকাশে। বৌদিরও তবে খাস্তদাকে দেখে নয়, আমাকে দেখে।

কণিকা বসুরায়কে সেই আমি শেষ দেখেছিলাম।

প্রেমিকা

প্লেইন লিভিং হাই থিঙ্কিং বোধহয় একেই বলে। টেক-অফ্‌ এর পর পায়ের নীচে পৃথিবীর রানওয়ে পাপোষের মত ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু-চিন্তা মনে আসতে আরম্ভ করে। নানান পাড়ার অভিজাত দর্জির আর আধুনিক নাপিতের যুগলকাঁচির চিহ্নের মধ্যে বসে, চার-পাশের মাথা কাঁধ ঘাড় আর বাহু-মূল্যের হেয়ারকাট, ক্লিয়ার কাট, মায় শর্ট কাট্‌ পর্যন্ত দেখতে দেখতে একটা অদ্ভুত আচ্ছন্নতার ছাঁট চিন্তায় যখন অসাড় আর বধির হয়ে পড়েছি—প্রপেলার হুইশপার, আর ফুয়েল গার্গলিঙের ভাইব্রেশন যখন শ্রবণ-শোণিত মারফৎ একেবারে মর্মে-মগজে প্রবেশ করেছে, ঠিক তখনই অপ্সরা রমণী বিমান-সহচরীদের কাকলি আমার কানে এলো।

পার হেড অন্তরঙ্গভাবে ঝুঁকে পড়ে মুখোরোচক ইংরেজি আর সুগন্ধি বাংলায় কুশলপ্রশ্ন এবং লাইফ জ্যাকেট থেকে কফি-চকোলেট ইস্তক সংলাপ চালিয়ে যাওয়া ত সহজ কথা নয়! আর সত্যি বলতে কি, এমন প্রমাণ সাইজের অবাস্তব রকম সুন্দরী যুবতীরা যে পরীহুরীর মতই মর্ত্তের মর্মে-মরে-থাকা মানুষের গায়ে পড়ে চোখে চোখে নিলাজ হাস্য-বিনিময় করবে, ভাবাই যায় না।

আমরা কেউ কেউ, বহু নিচু-তলার সংসারে যেসব অট্টহাসিনী, কলহ-পটিয়সী বহুবাচনাদের রেখে এসেছি; ট্যারাবেঁকা, খুঁতখুতিতে ভরা যেসব কু-রঙ্গিণীদের—সে তুলনায় 'হায়ার লেভেলে' উঠে এ যেন স্ক্রি-লাভারের টেক্‌নিকালার স্বপ্ন।

মায়াবিনীরা ছেলেভোলানো মোয়ার মত কিছু না কিছু সকলের হাতেই দিচ্ছেন দেখে আমি বিনা বাক্যব্যায়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ইলেকট্রিক শকের মত একটা রামচিমটি খেয়ে পাশে দাঁড়ান সেই তিন কিস্তী

মাপ-সই সুন্দরীর মুখের দিকে চমকে তাকালাম।

'লোচ্চনদা,' মুচকি হেসে তরুণীটি শুধালো, 'চিনতে পারেন?'

তেইশ চব্বিশ বছরের আইভরি ফিনিশ একটি মূর্তি মাথায় ওলটানো টবের মত ঢাউস কেশকুণ্ডল, চিত্রিত ভ্রূ, আঁখিপত্রে আইলাইনার, ঠোঁটে সাদাটে চন্দনের মত ঝাপ্সু লিপস্টিকের দাগ, মুক্তারঙ্ ঝিনুকের মত ইঞ্চিটাক প্রোগ্রেসিভ নখ,—সব মিলিয়ে একটি প্রিন্টেড রমণী। নাঃ কস্মিন কালেও এই অর্বাচীনকে চিনতাম না। মাথা নেড়ে সরাসরি তাই জানালাম।

ছবির মত হেসে উঠল মেয়েটি, 'ইস্, চিনতেই পারলাম না। অন্য কোনো মেয়ে হলে এ অপমানে সুইসাইড করত তা জানেন?'

'তা জানি না।' মৃদু হেসে বললাম, 'তবে তোমার মত ম্যালিগন্যান্ট সুন্দরী সুইসাইড সামান্য কথা, খুন করলেও বেকসুর খালাস পেত তা জানি। তুমি বললাম—কিছু মনে করো না।'

খিল খিল করে হেসে উঠে মেয়েটি বলল, 'যা আপনি ভারি অসভ্য।'

ভীতভাবে চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে বললাম, 'যেভাবেই মারো, সুন্দরী, পাবলিকলি মেরো না। বড় অসহায়'—

'যান আপনি বড্ড হাসান।' দমবন্ধ হাসি হাসতে হাসতে ফাঁকে বলল ও।

মনের মধ্যে দ্রুত অ্যালবাম উল্টে চলেছি আমি তখন। কিন্তু না। এ মুখের কোনো প্রিন্ট সেখানে নেই। সব সুন্দরী মেয়েকেই এক এক বয়সে চেনা, আর এক বয়সে অচেনা লাগে। আমার দু'রকম বয়সই হয়েছে; সুতরাং—

'আপনাকে আমার ভীষণ দরকার লোচ্চনদা। কদ্দিন থেকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—'

ওর কথা কানে না তুলেই আমি পাল্টা শুধাই, 'কদ্দিন থেকে উড়ে বেড়াচ্ছ এরকম? মানে তোমার সরকারী ডানা গজিয়েছে কদ্দিন?'

হেসে উঠলো খিল খিলিয়ে নাম না-জানা সুন্দরী, 'তা এই আঠার মাস হবে।'

'এইবার নামটা বলে ফেল দিকি লক্ষ্মী মেয়ের মত।'

'এ মেয়েকে চিনতে সময় লাগবে দাদা।' চোখে মুখে দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে ও বলল, 'আচ্ছা বরং একটা ছদ্মনাম ভেবে নিই আগে চট পট।...হ্যাঁ আমার নাম ধরুন রটনা। পছন্দ আপনার?'

'মেয়েলি রটনা? রটনা কি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ?' আমি শুধাই।

'হিন্দীতে নিশ্চয়ই। হিন্দীতে শুনেছি এভরিথিং স্ত্রীলিঙ্গ। ব্যাকরণের কাঠগড়ান কোনো শব্দ হস্টাইল উইটনেসেব মত এসে দাঁড়ালেই তাকে স্ত্রীলিঙ্গ অ্যানাউন্স করা হয়। তা লোচ্চনদা, আমি লাইফ দিতে রাজী আছি আপনি আমাকে নিয়ে একখানা ডাগর উপন্যাস লিখুন। লিখবেন?'

'উপন্যাস!' আমি প্রায় আকাশ থেকে পড়ি, 'আমি লিখবো উপন্যাস? তাও আবার তোমাকে নিয়ে?'

'কেন আমি কি খোলামকুচি নাকি?' আমার পাশেব শূন্য সীটে সেঁটে বসে পড়ল বটনা, 'আপনার ওই হেজিপেজি দেডকলমী নারীভূড়ির থেকে আমি কিছু ফেলনা না। ববং' নিজেব বুকে বুড়ো আঙুল ছুঁইয়ে বলল, 'আপনার টাকে চুল খাড়া করবাব মত মেটিরিয়াল পাবেন। হটকেক্ হয়ে যাবে একখানা—'

আমি ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'রটনা মুখ খাবাপ করিস না। তোকে খেলনাও ভাবিনি ফ্যালনাও না। কিন্তু উপন্যাস লেখা চাট্টিখানি কথা নয়, অত মালমশলা রসরসদ তোকে নিংড়োলে যদিবা বেরোয় ভয়েই আমার কলমের কালি শুকিয়ে যাবে।'

আসলে রটনাকে আমি ততক্ষণে ধরে ফেলেছি। প্রথমে চিমটি খেয়েই চেনা উচিত ছিল যে, বছর দশেক আগের রত্না হাজরাই ফিগার বদলে রটনা হয়েছে। কিন্তু বিয়ের আগেও যে মেয়েরা এমন আপাদমস্তক আকাশ-পাতাল বদলায়, আগে কি জানতাম কখনো! পেটের কি এক দুর্জ্ঞেয় রোগে সেদিনের তের বছরের রত্না ছিল দড়ি-পাকানো সাত আট বছরের রুগ্ন চেহারা। শিরাবহুল, চর্মসার দেহ। ভুরু কুঁচকেই থাকতো, মুখে কস্মিনকালেও হাসি ছিল না বসে বসে

ধুঁকতো। এমনিতে লাজুক কিন্তু রাগিয়ে দিলে ছুটে এসে গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চিমটি কাটতে কাটতেই ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলত। ওই শুকনো চেহারা থেকে অত জল কি করে বেরোতো ভেবে অবাক হতাম। সেই রত্না, যাকে আমি রাগিয়ে দেবার জন্যে চিমটিরানী বলে ডাকতাম, সে এমন স্বাস্থ্যল, হাসি-খুশি, প্রায় যৌবনমদেমত্তা সুন্দরী হয়ে উঠলো ভেবে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মাদুলী-মিরাকল ছাড়া কি সম্ভব?

রটনা অর্থাৎ রত্না আমার কথার জবাবে বলল, 'আপনি বরাবরই একটা ভিতুর ডিম, আমি জানি। উপন্যাস লেখা আজকাল কিস্যু না, আমি নিজেই লিখতাম কিন্তু নিজের কথা নিজে লিখতে একটু লজ্জা-লজ্জা করে তাই।'

'আমাকে বলতে তোমাব লজ্জা করবে না?'

'বারে, আপনি তো আমাকে চিনতেই পারেন নি। ছদ্মনামে কি লজ্জা থাকে?'

নিজের অর্ধসম্পূর্ণ টাক চুলকে আমি বললাম, 'তা বটে। আমি তোকে বিলকুল ট্রেস করতে পারছি না। তুই বলছি বলে তো'—

'আবার!' রত্না আমার বাহুমুলে চিমটি কেটে বললো, 'জানেন লোচ্চনদা এক এক ট্রিপে আমি কত উড়ো প্রেম পত্র পাই? আপনি ইমাজিন করতে পারবেন না। এই যে ঘড়ি দেখছেন এটাও আপনার ভাষায় উড়ন্ত উপহার, কিন্তু কত নম্বর প্রেজেন্টেশন তা নিশ্চয় জানেন না। জানেন না নিশ্চয় যে এই প্লেনের মধ্যেই আমার দু'জন প্রেমিক চলেছেন অথচ কেউ কাউকে চেনেন না। এবং বিনা কাজে, শুধু আমার জন্যেই আমাকে একটু কাছে পাবার জন্যেই তাঁরা চলেছেন। আমি খুব হার্ড নাট লোচ্চনদা, পলকা চিনেবাদাম নই যে, দু আঙুলের টিপ্পনীতেই খুলে যাব। প্রতি টেক-অফ এর দিনে দমদমে আমার জন্যে অন্তত হাফ ডজন রুমাল ওড়ে, রেলিং-এর ওপারের বেচারীদের। জানেন কি?"

তারপর হঠাৎ রুমালে মুখ ঢেকে লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো।

আমি সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললাম, 'এতে হাসির কি হলো ?'

—অন্য একটা ব্যাপারে হাসছি, মনে পড়ে গেল কিনা।

—ও। বলে আমি জানলার দিকে মুখ ফেরালাম।

—আপনি রাগ করবেন না ত লোচ্চনদা হাসতে হাসতেই রত্না বলল !

—রাগ করবো কেন বলো।'

—আমি না ছোটবেলায় আপনাকে ভীষণ ভালোবেসে ফেলেছিলাম। কি করে যে, আজ তো দেখলে শুধু হাসিই পায় মনে হয় হেসেই আপনার গায়ে গড়িয়ে পড়ি।

স্ত্রীআচার

মুসৌরীতে এখন বাঙালী সীজন শেষ। টুরিস্ট শহর মুসৌরী এখন যেন মেকআপ-তোলা রংচটা রঙ্গনটী, গ্রীনরুমের বাসি আয়নায় কাঁদছে। হোটেলগুলোয় একে একে নিভিছে দেউটি। স্কেটিং রিংক চামচিকে-ওড়া জলসা ঘরের মত, সিনেমা হলগুলিতে সাকুল্যে বিশ-পঁচিশজন দর্শক। আগুপিছু চার-মুনিষ্য-টানা ফিটনতুল্য অভিজাত রিকশাগুলি শখের সওয়ারী নিয়ে কদাচিৎ দু-পাঁচখানা আসছে যাচ্ছে। তবু কুলরি বাজারের দিকেই এখনও যাকিছু মানুষের ভিড়, একটু যাকিছু উত্তাপ আর রং লেগে আছে।

ম্যাল রোডের স্ট্যানডার্ড স্কেটিং রিংকের সেই দগ্ধ বিধ্বস্ত ভগ্নাবশেষ পার হয়ে এলাম। চল্লিশের ব্ল্যাক-আউট, সাইরেন আর বম্বিং-এর ধুলোবালি অন্ধকারের রাতগুলি মনের মধ্যে নাগরদোলায়

মত দ্রুত ঘুরপাক খেয়ে গেল। পথের ধারের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে স্মৃতির টাল সামলে নিচ্ছিলাম, সামনে উপত্যকার ঝাপসা সবুজ আঁচলের মধ্যে দেরাদুন-হরিদ্বারের সুদূর বসতি। আমার পাশ দিয়ে ছোট্ট ভাইটিকে কোলে নিয়ে সবুজ কটেজের সেই 'জিন'-এ পাওয়া সপ্ত-কিশোরী মেয়েটি কুইনের মত হেঁটে গেল। মর্নিং ওভারকোট, বিদেশী দস্তানা, আঁকা ভুরু; আইল্যাশ এখনও ট্রাই করেনি। একটু তফাতে গর্বিত আড়চোখে তার মধ্যবিত্ত দিদি আর মা চলেছেন। ফেটাল অয়রনি ভাবছিলাম মনে মনে, এমন সময়—

এমন সময় সেই নৈহাটির হোয়াট-নট বৌদিদির সঙ্গে দেখা। নৈহাটি বৌদিদি মানেই গুটিতিনেক কলেজে পড়ন্ত মেয়ে, ড্রেনপাইপ সভ্যতার দু'টি যুবককল্প আনকোরা কিশোর, একটি হোল্ডঅলসদৃশ স্থূলকায় শয্যাশীল দাদা, তৎপ্রণীত গুটি-তিনেক পিঠাপিঠি হুড়মুড়িয়ে আসা বালখিল্য এবং সকলের ব্যাকগ্রাউণ্ডে অনেককাল-তিরিশে থাকা হোয়াটনট শপের মত বৌদিদি। চোখে দক্ষিণী সুর্মা, আন-অ্যাব্রিজড্ কথকতা-নিঃসৃত মুখে একটুখানি বিলাসিনী পান, হাতে পশমের প্রি-ম্যাচিয়োর্ড গোলা। সঙ্গে ট্রাঙ্ক-বাসকেট-স্যুটকেশ ঝুড়ি-ঝাঁপি-ঝোলা-হাতব্যাগ, ক্যারিয়ার-ফ্লাস্ক-ওয়াটার বটল, গুটি দুই-তিন ভিন মডেলের স্টোভ, হাঁড়ি ডেচকি, হোল্ডঅল, হেঁচকি ওঠার ওষুধ থেকে সাপের কামড়ের, কালমেঘ-চিরতা থেকে থার্মোমিটার, ফিডিং বটল-এর নীপল থেকে দাদার টপসিক্রেট্ নাইট-উইয়্যার পর্যন্ত বৌদিদির মোবাইল ভাঁড়াড়ে পাওয়া যাবে। এ ছাড়াও আছে খানকয় চিত্ত-চমৎকারী বাংলা উপন্যাস, ওয়েলকাম লেখা খান দুই অলপ্রেয়ে পাপোস, শারদীয় নাড়ু-মোয়া-মুড়কি, আম-লেবু-আমলকীর আচার, পানের সজাতি সরঞ্জাম কার্স্টএডের বাক্স, ট্রানজিসটর, মায় বেতারজগৎ পর্যন্ত। এক কথায় বৌদিদি খালি বাড়িখানাকে শুধু ফেলে এসেছেন।

এই বৌদিদি বাহিনীর সঙ্গে তুফানে দুই দিন এক রাত্রি বাস করেছি, ফলে তাদের নৈহাটি শ্লোগান শুনতে শুনতে জিব্য আস্য গেছে।

তারপর হরিদ্বার-হৃষিকেশ-লছমনঝোলা, ওদিকে আগ্রা জয়পুর খতম করে দিগ্‌বিজয়ী বৌদি মুসৌরী কব্জা করতে নেমেছেন মনে হল।

বৌদিই প্রথমে সহাস্য সম্ভাষণ জানালেন, 'এই যে লোচন ঠাকুরপো, কবে পৌঁছোলেন আপনারা? কাল? বাসে না ট্যাক্সিতে? আচেন কোতায়? অ্যাঃ, লাইব্রেরী ক্লাবে? সেটা কি আবার, হোটেল? তাই বলুন। চার্জ কত? ডিশ চার্জ?'

বললাম 'মুসৌরীতে অফ সীজনে বাঁধাধরা কোথাও কিছু নেই, যার কাছ থেকে যা আদায় করতে পারে।'

'তাই নাকি? তাহলে আমাদের কিছু সুবিধে করতে পারেনি। হেঁ হেঁ……আমরা ড্যাম চীপে হোটেলে পেয়ে গেছি—এত সস্তায় কোথাও আর মাথা গেলাতে হবে না। অল ফার্নিশড্, অ্যাটাচড্ বাথ। নামেই ডবল বেড রুম, কিন্তু রয়েছি সাতজন। দক্ষিণা কত বলুন তো? হুঁ হুঁ সে আর বলতে হচ্ছে না—।

আমি বললাম, 'চার?'

'চার? চার টাকা। খাইয়ে দেবে'—বৌদি ভ্রূকুটি করলেন, 'দশ টাকা। পার হেড মানে মাথাপিছু হলো গিয়ে—'

আমি বললাম, 'আমাদেরও অ্যায়সা বড় ঘর, মোজেক করা মেঝে ডবল বেড পড়েও বল ড্যান্স করার মত জায়গা থাকে—কিন্তু চার টাকা। তবে খাইয়ে দেয় না', হাসি চেপে বললাম, 'আমরা বাইরে খাই পাঞ্জাব হোটেলে।'

'ঠাকুরপো!' হাতার কাছটা খপ করে ধরে ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'মাইরি?'

মাকালীর মত জিভ বের করে আমি বললাম, 'কালীর দিব্যি।'

বিদায় নিলাম। আমার সঙ্গিনী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'তুমি মার্ডার করলে। তোমার নৈহাটি পার্টি এসে জুটলো বলে।'

বললাম, 'পাগলা নাকি! দুদিনের জন্যে আবার হোটেল বদলায় নাকি কেউ? তাও ওই গন্ধমাদন প্রমাণ লটবহর নিয়ে!'

নারীজ্ঞান আমার কত কম টের পেলাম সেই বিকেলেই। আমাদের

পাশের কামরায় নৈহাটি বৌদি সপরিবার এসে গেলেন। দু ঘরের দু'টি ওয়াড্রোব দিয়ে মাঝের পাল্লাহীন দরজাটার মুখ চাপা দেওয়া হয়েছে! উঁকি ঝুঁকি মারলে তবু সেই কপট কপাটের ফাঁক ফোকর দেখা যায়। আলোর রেখা, কথার টুকরো চোখে কানে এসে লাগে।

সঙ্গিনী চোখে তারাবাজি ঝরিয়ে বললেন, 'নাও হলো তো? একা নিরিবিলি ছিলাম, তাও তোমার সহ্য হলো না, মুখ্যু কোথাকার!'

সত্যি নৈহাটি বৌদিদির এত কাছে তো কখনো এর আগে থাকিনি। ট্রেনের মধ্যে সে আলাদা কথা। মানে টিকেটের দূরত্ব তার ওপর ট্রেনে ধকল আর ধকধকানি, নানা জাতের মনুষ্যত্ব আর অপরিচয়ের আবডাল। কিন্তু এখানে সেই পর্দাফর্দা নেই। সুতরাং বৌদিদির সমস্ত মনোযোগ পড়ল আমাদের দিকে মানে আমার ওপর।

আমার সঙ্গিনী নিঃশব্দে কেঁদে কেটে একা একা ব্রিজ সিনেমায় ছবি দেখতে চলে গেল। আমি খোয়াড়ে পড়া গরুর মতন বৌদির সঙ্গে লুডোর জাবনা কাটতে বসে গেলাম অগত্যা। দার্জিলিং-এর লুডো বাহন শ্যামসুন্দরের কথা মনে পড়ে গেল, কি সুখেই যে মেয়েদের সঙ্গে লুডো খেলে, সে হতভাগা!

'কি ঠাকুরপো ম্যাজিক জানেন নাকি ভাই।'

বিস্মিত হয়ে দু হাত তুলে দেখাই, 'কই হাতসাফাই তো কিছু করিনি!'

'আর সাফাই গাইতে হবে না। করেননি তো এটি এলো কোত্থেকে?'

কোন পাকা ঘুটির কথা বলছেন ধরতে না পেরে বললাম, 'কোনটি?'

'কোনটি'? চোখ মটকে হাসলেন, 'হরিদ্বার পর্যন্ত বন্ধু দেখলাম, এখানে একেবারে বান্ধবী? মাত্তর সাড়ে ছ হাজার অলটিচুডেই এই অবস্থা? আমেরিকায় সে সব হয় শুনেছি—পুরুষরা পটাপট মেয়ে হয়ে যায়—'

রাতে সঙ্গিনী আমাকে অবাক করে দিলেন। বললেন, 'কাল

হিমালয়ান ক্লাবে চলে যাবো আমরা, সেখানে তিন টাকা পার ডে।
তুমি যেন আবার তোমার পীরিতের বৌদিদিকে খবরটা দিয়ো না।
বোধ হয় একটা ঘর এখনো খালি আছে।'

আমি ফ্যাকাশে মুখে বললাম, 'অ্যাঃ। ওয়ার্ডরোবের পাশ থেকে সরে এসে চেঁচাও শুনতে পাবে যে!'

পরদিন সকালে চা খেতে খেতেই খবরটি পেলাম। সঙ্গিনী বিজয়িনীর হাসি হেসে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ওনারা হিমালয়ান ক্লাবে চলে গেলেন এই মাত্তর। পার ডে তিন টাকা তো!'

কমলি

বেনারসের দশাশ্বমেধ ঘাটে ব'সে অতি তরিবৎ ক'রে ফুচকা খাচ্ছিলাম! সঙ্গে কোনো মহিলা কলেজের এক দোর্দণ্ডপ্রতাপ অধ্যাপকও ছিলেন। প্রতিবার ফুচকা মুখে ফেলার আগে ভদ্রলোক ফ্যাকাশে মুখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলেন। ভাবখানা, এই বুঝি কোনো ছাত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হয়ে গেল।

হঠাৎ অধ্যাপকবন্ধুর চাপা আর্তনাদ শুনে তাকিয়ে দেখি বাইশ তেইশ বছরের একটি যুবতী আমাদের দিকেই সহাস্যবদনে এগিয়ে আসছে। বুঝলাম, বন্ধুবরের আর রক্ষে নেই! এ মেয়ে তো মেয়ে ছাত্রী নিশ্চয়। কোনো রোলকলের খাতা থেকে ক্লিন উঠে এসেছে! কিন্তু মেয়েটি কোনো নমস্কার-ফমস্কার ঠুকলো না, কাছে এসে বললে, 'বসতে পারি?'

মেয়েটির বসতে না পাবার কোনো কারণ দেখতে পেলাম না, আমার এপাশে ওপাশে হাত কয়েক জায়গা তখনো ফাঁকাই, পড়েছিল। বলালম, 'নিশ্চয়।'

ব'সে পড়লো মেয়েটি। সঙ্গে সঙ্গে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অধ্যাপক আমার কানে কানে বললেন, 'না মশাই এ নয়। হলে নমস্কার করতো।'

আমি বললাম, 'তবে ?'

'বেশভূষা ভঙ্গি দেখছেন ? কোনো স্বদেশী হিপি নয় তো ? মানে হিপিনী আর কি !'

অধ্যাপকের স্বাভাবিক রহস্যবোধ আবার ফিরে এসেছে দেখে খুশি হলাম। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে আমি দেখে নিয়েছিলাম। মেয়েটির পরনে আধময়লা শালোয়ার-পাঞ্জাবী, খালি পা। চশমার কাচে আর মাথার রুক্ষ চুলে এক পরত ধুলোর আস্তর জমেছে।

অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বললাম, 'হিপিরা একা থাকে না। কিন্তু মশায়ের কি হিপি-ফোবিয়া আছে ?'

নিচু গলায় বললেও কথাটা বোধকরি মেয়েটির কানে গিয়েছিল, সে চমকে একবার আমাদের দুজনের মুখের দিকে তাকালো।

কমলীর সঙ্গে এই প্রথম আলাপ। পুরোনাম কমলিনী বসু। বেনারস বেড়াতে এসেছে এম. এ পরীক্ষা দিয়ে এখন পারফেক্ট্ বেকার। পৈতৃক অবস্থা সম্ভবত ভাল, পুরানা বালীগঞ্জে বাড়ি। উঠেছে, সিদ্ধগিরিবাগের এক বাগান-বাড়িতে। সকাল বিকেল বড় গৈবীর জল আনিয়ে আকণ্ঠ পান করছে, আর টোটো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

'আপনাকে কদিন ধরেই ইতিউতি দেখছি', আত্মপরিচিত দানের এক ফাঁকে কমলী আমাকে বলল, 'ভেরি ইণ্টারেস্টিং।'

আমার চমকাবার পালা এইবার। কদিন ধ'রে আমাকে নজরে রেখেছে অথচ আমি খেয়াল করিনি একবারও। মেয়েট হয় নির্জলা মিথ্যে কথা বলছে, নয়ত কোনো মেয়ে গোয়েন্দা। মেয়েরা তো আজকাল পুলিশে আকছার সেঁধিয়ে যাচ্ছে। আর নারী-পুলিশ মানেই পারফেক্ট্ বেকার।

হেসে কমলী বলল, 'বিশ্বাস হলো না ? আপনি ত গত চারদিন ধ'রে পাঁড়েজীর ধর্মশালায় আছেন। কাল জলযোগে ব'সে বিস্তর মিষ্টি খেয়েছেন সন্ধ্যে বেলায়। তারপর পণ্ডিতজীর দোকানে সিদ্ধির সরবৎ—আরো বলবো ?'

শেষ ফুচকাটা তখনও আমার মুখের মধ্যে জলসুদ্ধ ইনট্যাক্ট রয়েছে, তাই মুখ দিয়ে গোঙানীর মত একটু শব্দ বেরোলো, হাত নেড়ে ওকে থামতে বললাম। মুখ খালাস হতেই ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে বললাম, 'তুমি তো সাংঘাতিক মেয়ে হে! আগে জানলে বসতেই বলতাম না।'

'না বললেও বসতাম, আপনাকে ছাড়তাম নাকি?' কমলি প্রায় বালিকার মত খিলখিলিয়ে হাসতে লাগল।

ওর ওপরের সারির বড় দাঁতদুটির মাঝখানে একটু ফাঁক, নীচের ঠোঁট কমলার কোয়ার মত পুরু, নরম আর আঠালো, চোখের জমিতে জলের আভাস। হাসলে দাঁত দেখা যায়, চোখ দুটো ছোট হয়ে প্রায় বুজে আসে। ওকে খুব সরল মনে হয় তাই বুঝি। চেহারাপত্তর ভালোই, একটু বেঁটে; কিন্তু চুলে খাটো নয়! চুলের মুঠোয় ধরা যায় না।

হাসতে হাসতেই কমলী আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি জলযোগের অদ্বৈত লাহাকে চেনেন?'

'না। তাকে খামোকা চিনতে যাবো কেন?' আমি একটু খেঁকিয়ে জবাব দিই, পয়সা দিয়েই মিষ্টি খাই হে, মিষ্টির লোকদের চেনার দরকার হয় না আমার।"

কমলী কিন্তু ম্লান হলো না, থামলোও না, অদম্য উৎসাহে বলেই চলল, 'উনি আমার বন্ধুর ছোটমামা হন। জানেন না বুঝি ওঁদের বাগান বাড়ীতেই আমি আছি।' স্থির দৃষ্টিতে আমার ভুঁড়ির দিকে তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল।

আমি বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হলাম বলাই বাহুল্য। মেয়েটা একটু বেয়াড়া আছে।

'দাদা, আপনাকে আমি গুরু করবো।' কমলী আর একটা বম্বশেল ছোঁড়ে। ওর মাথায় নির্ঘাত ক্র্যাক্ ধরেছে টের পাওয়া মাত্র আমি শঙ্কিত হই। ওকে গুরুত্ব না দিয়ে আমি বন্ধুর দিকে চেয়ে বলি, 'চলুন, এবার ওঠা যাক।'

অধ্যাপকের অন্তরাত্মাও এতক্ষণ সেই কথাই বলছিল সম্ভবত,

বলামাত্র তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গে কমলিনীও। বলল, 'আমার তাহ'লে আর ফুচকা খাওয়া হলো না।'

এবার সত্যিই গা জ্বালা ক'রে উঠল আমার, বললাম, 'ফাজিল অবতার হিউজ ফুচকা এখনো অবশিষ্ট আছে, মনের সুখে বসে বসে খাও। আমরা চলি'—

ফুচকার দাম মিটিয়ে ঘাট থেকে উঠে গলিপথ ধরলাম আমরা। মিনিট কয়েক পরে পিছন ফিরে দেখি, কমলীও ছাড়বার পাত্রী নয়, ঠিক আসছে! কমলী নাছাড়, আমরাও নাচার। সেই যাত্রায় যে ক'দিন বেনারসে ছিলাম, মিস্টার কমলিনী প্রায় ছায়ার মত আমাদের গায়ে গায়ে লেগে ছিল। লেগে থাকুক তাতে ক্ষতি নেই। একটা মেয়ে, হোক সে ছিটিয়াল, নিজের নারীত্ব সম্বন্ধে হোক সে অন্যমনস্ক, এই বয়সে মন্দ লাগে না। কিন্তু ফ্যাসাদ বেধেছে কমলী কথা কওয়ায়। ফুটন্ত কেটলীর মত অনর্গল সে কথা বলবে।, টাইপ-রাইটারের মত দ্রুত তার জিভ, মিনিটে আশী থেকে একশোটা শব্দ তার মুখ দিয়ে কোন্ না নিঃসৃত হয়। বিষয়বস্তু বলে কিছু নেই, শ্রোতার হুঁ-হাঁ-র পর্যন্ত তোয়াক্কা রাখে না। নিজের কথা নিজের চেনা জানার এবং তস্য তস্য তস্য চেনা জানা মানুষের অজানা অচেনা গল্পে সে মশগুল, প্রায় ডগমগ। সেই অনর্গল কথার ফাঁকে ফোকরে স্যাণ্ডউইচড্ হওয়া সব প্রশ্ন বেরিয়ে আসে মাঝে-মধ্যে; উত্তর দেবার প্রয়োজন হয় না, উত্তর সে নিজেই দেয়। এই নিদারুণ কথ্য মেয়েকে-যে বিয়ে করবে তার কথা ভেবে শিউরে উঠি। এ মেয়ে নির্ঘাত সাড়ে তিন মাসের মাথায় বিধবা হবে, যদি না কোনো নিরেট কালাকে বিয়ে করে। আমরা তো রাতটুকুর জন্যে রেহাই পাই, কিন্তু বেচারী স্বামী?

দোকানীর কাছে যেমন খদ্দের, লেখকের কাছে তেমনি মেয়েরা, সাক্ষাৎ লক্ষ্মী অবতার। দুধেল গাইয়ের মত তার চাট-চোট্ সইতেই হয়। কমলীকেও হজম করার তালে ছিলাম সে-কারণে, ভেবেছিলাম বঙ্গদেশে ফিরে একখানা ডাঁশা গল্প লিখবো বাছাধন টের পাবে তখন,

-কার পাল্লায় পড়েছিল! খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওকে মনের মধ্যে টুকে নিচ্ছিলাম তাই। বারকয়েক অনুরোধ করার পর সিধুগিরিবাগে একদিন হাজিরও হলাম ওর ডেরায়। কড়া নাড়াতেই দ্বারোদ্ঘাটন করল শ্রীমতী কমলিনী, পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর আদ্দির ফতুয়া।

আমার তাজ্জব-নজরানা দেখে ও একটু তৃপ্তির হাসি হাসল, 'লুঙ্গি পরতে আমার খুব ভালো লাগে। লুঙ্গি প্লাস ফতুয়া, সুপার্ব! তুলনা হয় না, কি বলেন?'

গম্ভীর গলায় বললাম, 'হুঁঃ। জবাব নেই!'

জবাব পেয়ে গেলাম বাংলা দেশে ফিরে মাসখানেক পরেই। ডাকে আসা একখানা হিন্দী পত্রিকার পাতা উল্টাচ্ছিলাম একটু আগ্রহ নিয়েই। আমার কোনো গল্পটল্প অনুবাদ হয়েছে ভেবেছিলাম। কিন্তু না, কোথাও আমার ঘুণাক্ষরে নাম নেই। হঠাৎ চোখে পড়লো একটা সচিত্র গল্প, আসলে ছবিগুলি দেখেই তাক লেগে গিয়েছিল আমার। বেনারসের গঙ্গার ঘাটে তেল মালিস করানোর, ফুচকা গলাধঃকরণের, সিদ্ধিলাভান্তের, গুটি তিনেক ছবি। 'দাশগুপ্ত' ভায়া হিংসে করবেন না নিশ্চয়, ছবিগুলি আমারই। এই কন্দর্পকান্তি মূর্তির কার্টুন। লেখিকা শ্রীমতী কমলিনী বসু, চিত্রকারিণীও তিনি।

আমি ফরাসের ওপর ফ্লাট হয়ে শুয়ে বানান ক'রে ক'রে সেই হিন্দী আত্ম-জীবনী পড়তে লাগলাম।